পঞ্চম অধ্যায়

শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ সাহিত্য ও কবিমানস

> ''মৌলিক রচনার সঙ্গে অনুবাদের পার্থক্য 'আসমান-জমিন' না হলেও নিতান্ত উপেক্ষণীয়ও নয়। মূলের ভাব, ভাষাভঙ্গি এবং মেজাজ ভাষান্তরেও পুরোপুরি সঞ্চারিত হওয়া কেবল অসম্ভবই নয়, সার্থক অনুবাদের ক্ষেত্রে তা হয়তো বা অনেকাংশে অযৌক্তিকও। প্রতিটি ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য তার বিশিষ্ট ভাষারীতি, শব্দভাণ্ডার, বাগ্‌ধারা, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতিতে নিহিত। তদুপরি দেশ-কাল-সমাজের রুচি ও মানসিকতার প্রতিফলন তাকে অন্য ভাষাগোষ্ঠী থেকে কেবল পৃথক করে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিতই করে না, অনন্যসাধারণ হয়ে উঠতেও সাহায্য করে। তথাপি অনুবাদকদের মধ্যে মতদ্বৈধের নিরাকরণ সম্ভব হয়নি। অনেকেই মূল রচনার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে আক্ষরিক অনুবাদের পক্ষপাতী; আবার অনেকেই মূলের ভাব বজায় রেখে দেশ-কাল-সমাজোপযোগী রূপান্তরেরই পক্ষালম্বী।''[১]

মৌলিক রচনার সঙ্গে অনূদিত রচনার অ-উপেক্ষণীয় পার্থক্য স্বীকার্য এবং স্মরণীয় অনুবাদের পার্থক্যের রকমফের অর্থাৎ সাহিত্যের এক শাখার অনুবাদ-ক্রিয়ার সঙ্গে আর এক শাখার অনুবাদ-ক্রিয়ার অসমানতা; যথা— কবিতার অনুবাদ-ক্রিয়ার সঙ্গে নাটকের অনুবাদ-ক্রিয়ার দূরত্ব। তবে অনুবাদ নিয়ে সুপ্রচুর পরস্পর বিপরীত মত— মতামত থাকা সত্ত্বেও, মূল রচনার অনেক রমণীয়তা বাদ পড়লেও অনুবাদকের বিনীত শ্রম-মগ্নতা-সৃষ্টিক্ষম-বিশ্বস্ততায় অনুবাদ সাহিত্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য হয়ে উঠেছে। স্মরণ অনিবার্য, অনুবাদ কেবলমাত্র আক্ষরিক, অর্থানুগত, অনুকৃতি নয়; অর্থাৎ কথার বদলে কথা অথবা কথা-ভাবের বদলে ভাব-কথা নয়, অনুবাদ রীতিমতো মন-মনন-জ্ঞান-যত্ন-সৃষ্টিচেতনা জড়িত। কেননা অনুবাদ্য একটি লেখা কেবলমাত্র বিচ্যুত একটি লেখামাত্র নয়, বিশেষ দেশ-কালের স্বতন্ত্র ভাষা-সংস্কৃতিবলয়ের লেখা— সেইলেখা সমান্তরিত হবার জন্য বিশেষ ধ্যান দাবী করে। গদ্যের অনুবাদ এবং কবিতার অনুবাদ নিয়ে একজন সমালোচক বলেছেন—

> ''একজন গদ্যরচয়িতার যা যা গুণগ্রাম থাকলে তিনি একজন উন্নতমানের গদ্যরচনার ভাষান্তরে সার্থক হ'তে পারেন সেই সব গুণপনা অর্জন করলেও একজন প্রকৃত কবি ভিন্ন ভাষার একজন কবির রচনার সার্থক অনুবাদকর্মে সার্থকতা লাভ করবেন এমন সিদ্ধান্ত সর্ববাদীসম্মত নয়। কারণ হিসেবে একজন যথার্থ কবি তাঁর আপন কবিকৃতির অন্ত ও বহিরঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে ভিন্ন কবির সার্থক পদ্ধতির ভাষান্তরে পারঙ্গম হবে, এমন কথা স্থির নিশ্চয়ে বলা যাবে না। ফলে এই অনুবাদের ক্ষেত্রে

অধিকাংশ রচনাই মূল রচনা অবলম্বনে অনুবাদকের নবতম সৃষ্টি হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ভাষান্তরিত ভিন্ন ভাষার কাব্যের বেলায় অনুবাদক কবির প্রাপ্তি সর্বাপেক্ষা অধিক কারণ, তাঁর কলম থেকে নির্গত হয় নতুন কবিতা— তাঁরই রচনাচিহ্ন বহন করে।''[২]

শঙ্খ ঘোষ সর্বার্থে কবি— মন্থর পুনরাবৃত্তি বা অবাধ প্রগল্‌ভতাহীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতন ভালোবাসার কবি; আত্ম-সমালোচনারও। এই সর্বার্থক কবির প্রাবন্ধিক হিসেবেও মান্যতা অতি উজ্জ্বল। এই কবি-সমালোচক শঙ্খ ঘোষ অনুবাদকও— তিনি মূলত মূলের ভাব বজায় রেখে দেশ-কাল-সময়োপযোগী রূপান্তরেরই পক্ষাবলম্বী। তাঁর ''ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ'' (১৯৭৩); ''চিড়িয়াখানা ও অন্যান্য কবিতা'' (১৯৭৯); ''হয়বদন'' (১৯৮৬); ''বহুল দেবতা বহু স্বর'' (১৯৮৬); ''রক্তকল্যাণ'' (১৯৯৬); ''ইরাকি কবিতার ছায়ায়'' (২০১০); ''মানুষ'' (২০১১); ''ইকবাল থেকে'' (২০১২); এবং অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সঙ্গে সম্পাদনা ''সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত'' (১৯৬৩) তাঁর অনূদিত সৃষ্টিকর্ম ও অনুবাদ কর্ম।

> ''সংখ্যার হিসেব দিয়ে নয়, তাঁর লেখালেখি নাড়াচাড়া করে কখনো মনে হবে স্পেনের প্রতি তার অনুরাগ বেশি, কখনো মনে হবে জার্মান। তবে এটা অস্পষ্ট নয়, যে কবিতায় অবয়বের কারুকৃতি বা প্রসঙ্গের অতিরেক বিদ্যমান তেমন কবিতায় তাঁর আগ্রহ নেই। যে কবিতায় বহুভাষিতা, যাতে উচ্চরোল, তাতে তাঁর আগ্রহ নেই। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নজর করলে হয়তো চোখে পড়বে নেরুদা বা এলুয়ার, ব্রেশ্‌ট বা চেরাবাণ্ডারাজু, হোচিমিন বা গ্যিয়েন— এঁদের বিপ্লব-স্পন্দিত শিল্প সৃজনের দিকে তাঁর আছে এক অনতিপ্রচ্ছন্ন বিনতি। তবে যে কবিতায় রাজনীতি উচ্চকিত, প্রত্যক্ষ, তাতে তাঁর বিচরণ অনিচ্ছায়, যা অমার্জিত, মন চায় তার বর্জন। আর কলকাতার কিছু মানুষ জানেন এই অনাটকীয় উচ্ছ্বাসরহিত, বাক্‌সংযত, মৃদুভাষী মানুষটির সঙ্গে নাট্যজগতের যোগটা নিবিড়। কলকাতার ষাট ও সত্তর দশরে ব্রেখট-চর্চা তাঁকেও নিশ্চয় প্রাণিত করেছিল। পাঠক এটাও খেয়াল না করে পারেন না, কবিতা, কাব্যময় গদ্য অনুবাদের দিকেই তাঁর প্রবণতা বেশি। হয়ত কবিসত্তা নিয়ন্ত্রণ করেছে অনুবাদকের নির্বাচনকে। স্বভাব কবিত্বে বা ভূতে পাওয়া কবিত্বে তাঁর আস্থা নেই, তাই মাতলামির মান্দাসে ভেসে অনুবাদে নামতেও তাঁর আস্থা নেই। সার্থক অনুবাদের জন্য চাই অনুবাদ্য কবিতার ভাষা ও অনুষঙ্গ বিষয়ে জ্ঞান, অনুবাদ্য ও অনূদিত দুই কবিতার ভাষার শব্দ, ধ্বনিস্পন্দন, বাক্যবন্ধন বিষয়ে সতর্কতা এবং অভিধানের সঙ্গে পরিশ্রমময় মৈত্রী। এগুলো তাঁর আছে। তাছাড়া শ্রীযুক্ত ঘোষ নিষ্ঠিত প্রাবন্ধিক, বহুবিষয়ী পাঠক শব্দসচেতন কবি বলেই সার্থক অনুবাদের কিছু দুর্লভ পরিচয় সম্ভব হয়েছে।''[৩]

—সংখ্যার হিসেবে নয়, অনুরাগের বিষয়েও নয়; অনুবাদক শঙ্খ ঘোষ অনূদিত জার্মান কবিতার দিকে দৃষ্টি রাখলে দেখা যায়— ক্লাউস গ্লোথ, ফ্রীডরিশ নীৎশে, স্টেফান গেয়র্গে, হুগো ফন হোফমানস্টাল, গেয়র্গ হাইম, হাইনরিশ হাইনে, বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট প্রমুখ কবির কবিতা সূচীবদ্ধ। ক্লাউস গ্লোথের অনূদিত 'বিদায়' কবিতাটিতে প্রেমের ধারাজল বর্ণিত, ফ্রীডরিশ নীৎশের কবিতা, অনূদিত 'পথিক, তার ছায়া' কবিতায় আত্মসংকট এবং আত্ম-অবস্থান 'ধাত্রী' শঙ্খ ঘোষের লেখায় সামগ্রিক সাফল্যে উচ্চারিত—

'' ফিরতে কি আর পারব না আমি? এগোতেও পারব না?
এমন-কি ওই পাহাড়ি হরিণ, ওরও পথ নেই খোলা?

তবে এখানেই থেকে যাই আর স্থির ধরে রাখি সবই—
দুহাতে আমার দুচোখে আমার যা-কিছু পরশ লাভ।

সামনে ছড়ানো পাঁচ ফুট জমি, এবং উষসী, আর
নিম্নে আমার ভুবন, মানব এবং মরণভার!''[৪]

বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট— শঙ্খ ঘোষ অনূদিত কবিতাসমূহ 'পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন', 'বই পোড়ানোর উৎসব', 'অজেয় লিপি', 'নেতারা যখন', 'অন্ধকার দিন', 'জওয়ানের বৌ', 'মানবধর্ম', 'শয়তানের মুখোশ', 'মা' নাটক থেকে, 'প্রশ্ন', 'একটি কবিতা', 'শ্রমিক অভিনেতাদের উদ্দেশ্যে', 'প্রিয়াকে নিয়ে', 'মাকে নিয়ে'। কবিতাগুলিতে চাপা ব্যঙ্গ, দুর্যোগের স্মৃতি, সভ্যতার মুখ-মুখোশ, মানবতার ছবি অঙ্কিত। স্বীকার্য যে, এইসব ছবি এবং শঙ্খ ঘোষের মানস-ভাবনার ছবি— কোথায় যেন স্বরের মিল পরিলক্ষিত হয়। এখানেই কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর নিজের বোধের সম্প্রসারণ ঘটান এবং ধরে রাখেন বিরাট ঐতিহ্যকে। 'পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন' কবিতায় বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট অনেক প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে সভ্যতা গড়ে তোলার শ্রমিক, দাস, সৈনিক, শুভাকাঙ্ক্ষী, সাধারণ মানুষের প্রেম-ভালোবাসার ছবি অঙ্কন করেছেন। 'বই পোড়ানোর উৎসব' কবিতায় 'বিপজ্জনক কথায় ভরা বইগুলিকে পোড়াতে হবে প্রকাশ্যেই' কিন্তু একজন প্রথম সারির কবি নির্বাসিত— সত্যবাদী কবি! কবি রাষ্ট্রের কলা-কৌশলকে অসাধারণভাবে কবিতায় এঁকেছেন। ''অজেয় লিপি' কবিতায় এক সোশ্যালিস্ট সৈনিকের লেনিনের প্রতি ভালোবাসা এবং আত্মবিশ্বাসের অনবদ্য তাৎপর্য ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'জওয়ানের বৌ' কবিতায় যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলায় রত সমস্ত দেশের জওয়ানের বউয়ের 'শোকাতুর' অবস্থার ছবি ফুটে উঠেছে। 'মানবধর্ম' কবিতায় আছে সমকালীন জীবনের অসততা, ভাঁওতা ও মিথ্যায় ভরপুর আটটি স্তবকের দ্বিতীয় ও চতুর্থ মিলবিন্যাসের যে অনুবাদ তা অনন্য। ম্যাক্সিম গোর্কীর 'মা' উপন্যাস অবলম্বনে ব্রেশ্‌ট লেখেন

'Die Mutter' (১৯৩০-৩১)— শঙ্খ ঘোষ অনূদিত 'মা' নাটক থেকে'— 'মায়ের কাছে বিপ্লবী শ্রমিকদের গান', 'কিংকর্তব্যের গান', 'ছেঁড়া জামার গান', 'লেখাপড়ার গুণকীর্তন', 'পাভেলের গান', 'মায়ের আবৃত্তি', 'কম্যুনিজমের গুণকীর্তন', 'মায়ের সংলাপ', 'ভ্যায়োভার গুণকীর্তন', 'বিপ্লবী শ্রমিকদের গান' 'মায়ের আবৃত্তি' অংশে অনূদিত। 'কম্যুনিজমের গুণকীর্তন' অংশে—

''এ পথটাই ঠিক সবাই বোঝে। সহজ।
তুমিও যদি মালিক না হও ঠিক বুঝবে।
এতেই তোমার ভালো; ব্যাপারটা সব জানো
নষ্টে একে নষ্টে বলে বোকায় বলে বোকা
এতেই বরং নষ্ট হবে বোকামি-নষ্টামি।''[৫]

বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট ছাড়াও আছে হাইনরিশ হাইনে, পল সেজান, গুন্টার গ্রাস প্রমুখ।

স্পেনীয় কবিতা— মূলত নিকোলাস গ্যিয়েন, আন্তনিও মাচাদো, পাবলো নেরুদা, আর্তুরো প্লাজা, হুয়ান রামোথ হিমেনেথ প্রমুখের কবিতা অনুবাদ করেন। আন্তনিও মাচাদো-এর শঙ্খ ঘোষ অনূদিত কবিতা 'কবিতা'—

''ও মেয়ে সুন্দরী—
কলমখানি ভরতে এলি
কাকচক্ষু জলে,
হঠাৎ আমায় দেখতে পেলে
তুলিস না তুই হাত,
অলকগুচ্ছ, চূর্ণ অলক
ঠিক করে নিস না,
স্ফটিক জলে তাকাস নে তুই
আত্মগরবিনী!''[৬]

—শিল্পময় অনুবাদ। আর্তুরো প্লাজা-এর 'বসন্ত' নামক কবিতাতে স্পষ্ট-বেদনা অঙ্কিত। পাবলো নেরুদা— অনূদিত 'সাঁজাই' কবিতায় নেরুদার যে জীবনের প্রতি ভালোবাসা এবং আত্মসমালোচনা তা গদ্যছন্দে তাৎপর্যপূর্ণভাবে চিত্রিত।

''মৃত্তিকার বক্ষে আমি, আর তুমি যেন
বিকীর্ণ ধূলির মতো প্রাণময় জেগে ওঠো, আর
যদি নদী পার করে পলি
দূরে ঢেকে রাখে নগ্ন জটিল শিকড়গুলি, ওরা
যেমন ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি তোমার সত্তা ছাড়াও আমার মধ্যে তুমি,

ওরই মতো সঙ্গে করে আনো এক দারুণ আঁধার।
তাই আজ এইখানে, শোণিতে অথবা শস্যে, মৃত্তিকায় অথবা আগুনে,
আমরা যেন বেঁচে থাকি কোনো এক তরু—
যে নিজের পাতাগুলি অবধি চেনে না!''[৭]

তাঁর 'দু-চার কথা বুঝিয়ে বলা', 'কেমন ছিল স্পেন' কবিতায় সার্থকতার চিত্র বর্তমান।

''ষাটের দশক শঙ্খ ঘোষের কাছে যদি হয় জার্মান কবিতার, তবে সত্তরের দশককে বলা যেতে পারে তৃতীয় বিশ্বের এবং স্পেনীয় কবিতার অনুবাদের কাল। আমাদের জানা আছে যে ষাটের দশকে তিনি অ-জার্মান কবিতারও অনুবাদ করেছেন, জানা আছে সত্তরে করেছেন অস্পেনীয় কবিতারও অনুবাদ। তবু সমাজতরঙ্গের অভিঘাত একেবারে অস্বীকার করা যাবে না, যায় না। আমাদের কাছে অপরিচিত কবি প্লাৎসা-র একটি কবিতা 'বসন্ত' পড়তে পাই 'সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত' কাব্য সংকলনে। তিন স্তবকের অসম পঙ্‌ক্তিযুক্ত মিলহীন রচনাটিতে বিগতযৌবন প্রৌঢ়ের বসন্তস্মৃতির বেদনা খুব একটা খারাপ ধরা পড়েনি। এর পরই নাম করতে হয় চিলির কবি পাবলো নেরুদার। সদ্য উল্লিখিত সংকলনে আছে 'সাঁজাই'— নেরুদার কবিধর্মের মূল সুরকে ধরতে কষ্ট হয় না। মানুষের প্রসঙ্গে উদ্ভিদ ও অরণ্যের চিত্রলতাকে জড়িয়ে দেওয়া এবং শূন্যতার মধ্যেও নিরবধি বেঁচে থাকার ইচ্ছা ধ্বনিত অনুবাদেও। এ কবিতাটিও গদ্যছন্দে লেখা, নেরুদার ধরণও অধিকাংশতই তাই। নেরুদার আর একটি কবিতা Explico algunas losas (দুচার কথা বুঝিয়ে বলি) তিনি অনুবাদ করেছেন, যা ১৯৮৮-র একটি সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কবিতাটি Residenciaen La tierra-র ৩য় খণ্ডের অংশ। এখানে কবি আলঙ্কারিক ভাষায় তাঁর সাহিত্যজীবনের পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের, জীবনার্থ সন্ধানের, স্পেনযুদ্ধে সক্রিয়তার, প্রিয় বন্ধুদের মৃত্যু ও নিগ্রহের অভিঘাতের দিক থেকে নেরুদার কবিতাবলির মধ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ কবিতা সন্দেহ নেই।''[৮]

হুয়ান রামোথ হিমেনেথ-এর কবিতার অনুবাদ 'স্ফুলিঙ্গ'-এ আটটি 'স্ফুলিঙ্গ' লাইন পাওয়া যায়— তাতে শঙ্খ ঘোষের গভীর মমতাময় মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

''ঠিক যেন প্রায় মানুষের মতো
গরিলা নামের জানোয়ার।
পায়ে থাবা নয়, পা-ই বলা যায় প্রায়
হাতে থাবা নয়, হাতই বলা যায় প্রায়।
এ যা বলছি তা

বনের গরিলা, মেলে যা আফ্রিকায়।

তোমার সামনে এই জানোয়ার
এও যেন প্রায়
পুরোপুরি এক গরিলা।
পায়ের বদলে পায়ে থাবা আছে এর।
হাতের বদলে হাতে থাবা আছে এর।

এ যা দেখাচ্ছি
গরিলা আমেরিকার।

আমাদের মহা চিড়িয়াখানার জন্য।
ধরেছেন একে ভ্রাম্যমাণ
প্রতিনিধি আমাদের।''[৯]

ইউরোপ বা আমেরিকা নয়, স্পেনীয় কবিতা অনুবাদের মূল ধরে কিউবার কবি নিকোলাস ক্রিস্তোবাল গ্যিয়েনই বাতিস্তা অর্থাৎ নিকোলাস গ্যিয়েনের ''EI Gram Zoo'' বা ''মহাচিড়িয়াখানা'' (১৯৬৭) এবং তাঁর অন্যান্য কবিতা নিয়ে শঙ্খ ঘোষ অনূদিত ''চিড়িয়াখানা ও অন্যান্য কবিতা'' (১৯৭৯) গ্রন্থটি। বইটির সূচনাকথায় বর্ণিত— বাবা কিউবার স্বাধীনতা যুদ্ধের যোদ্ধা এবং একটি পত্রিকার সম্পাদক। অতএব, বাবার রাজনৈতিক আলোচনা এবং বাড়ির লাইব্রেরী নিকোলাস গ্যিয়েনের প্রথম পাঠশালা। কবিতা লিখতে শুরু করেন রুবেন দারিয়ো-র প্রভাবে তবে অল্পকিছুদিনের মধ্যেই তা কাটিয়ে ওঠেন। প্রথম কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি— ''মেধা আর হৃদয়'' (১৯২৫), পাঁচ বছর লেখা বন্ধ এবং পরবর্তীতে নিজস্ব স্বর খুঁজে পাওয়া অর্থাৎ দাদাইজম-সুরিয়ালিজম-এর বৃত্ত থেকে সরে এসে লোকায়ত-লোকজীবনের জগৎ-জীবন ছন্দ-শব্দের মধ্যে ডুবে যান। কবিতার বিষয় হয়ে ওঠে কালো-মানুষদের জীবন-যাপন-ঐতিহ্য; সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে তাঁর কবিতার আয়োজন। আর তা সমস্ত লাতিন আমেরিকার বিপ্লবী ইতিহাস-রাজনীতি আধুনিকতার সূক্ষ্মতর বোধে উঠে আসে। তাই, লোর্কার কাছে কিউবার প্রধান পরিচয় 'নিকোলাস গ্যিয়েনের দেশ'। তাঁর কবিতায়—

''এই দিকটায়, ঈগল।
লাল ল্যাজঝোলা ঈগল।
সাম্রাজ্যিক ঈগল।

ফণিমনসার গায়ে বসে-থাকা ঈগল।
দুমুখো ঈগল (কাণ্ডই একখানা)
একাই একটা খাঁচায়
প্রাণদণ্ডিত বন্দীজনের
পাঁজরের থেকে ছেঁড়া
শোভন ঈগল।
টাকার ঈগল, দ্বিগুণ বানানো স্বর্ণমোহর (কুড়ি ডলারের)
ঘোষক ঈগল।
প্রুশীয় ঈগল, সতী বিধবার মতো কালো সাজে সাজা।
হাভানায় যেটি মাইনে উড়ছে সত্তর বৎসর।
ভিয়েৎনামের থেকে নিয়ে আসা ইয়াঙ্কি ঈগল।
রোম্যান অথবা নেপোলিয়নিক ঈগল।
আলতেয়ারের বিভা বুকে নিয়ে
স্বর্গীয় এক ঈগল।
আর শেষমেশ,
ঈগল ব্র্যাণ্ডে জমানো দুধের কৌটোয় গাঁথা ঈগল।
(আদি ও অকৃত্রিম।)''[১০]

এবং এই কাব্যগ্রন্থেরই 'অন্যান্য কবিতা' অংশের বিভিন্ন কবিতায় আত্ম-বিষাদকথার সঙ্গে জাগরণের কথা এবং পরাজয় কান্নার সঙ্গে বর্তমানের রক্তক্ষয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। আছে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, তবে সববিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে মায়াময়তা এবং মানবিকতা। শঙ্খ ঘোষ অনূদিত 'গভর্নর' কবিতায়—

''যখন তোমার কুকুরকে বেশ শেখাতে পেরেছ কীভাবে
ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় অসহায় কালো চামড়ার উপর
আর গ্রোগাসে ছিঁড়ে নিতে হয় যকৃৎ
যখন নিজেই বুঝে নিতে পারো
ঘেউ-ঘেউ আর ল্যাজ নাড়াবার শত কলাকৌশল,
মাতো আনন্দে, কেন না তখনই,
শ্বেত পুঙ্গব,
নিজেদের দেশে হতে পারো তুমি গভর্নর।''[১১]

—বর্তমান অবস্থার সিংহভাগ মেরুদণ্ডহীন ক্ষমতাধারীর ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং কিউবা এসে

যোগ দেয় ভারতবর্ষে, বাংলায়।

''এ হল এক সভ্যতাকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া, তার সঙ্গে মিশে থাকল কবির নিজস্বরের প্রসারণ— যেমন বলেন চার্লস টমলিনসন The Oxford Book of Verse in English Translation-এর ভূমিকায়। যা হোক, মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে গিয়ে সামান্য দু-এক জায়গায় অস্বস্তি জেগেছ যদিও সার্থকতার শক্তিমত্তাকে ছাপিয়ে তা কখনোই বড়ো হয়ে ওঠে না

'Tenor' কবিতাটির 'বেহালা' নামটি ভালো লাগল না 'মেট্রোপলিটানা' নিশ্চয়ই ছাপার ভুল। El Chulu (দালাল) কবিতার ৩য় পঙ্‌ক্তিটি বাদ দেওয়ার যুক্তি বোঝা গেল না। Aviso : Gran Zoo De la Habana (ঘোষণা : হাভানার চিড়িয়াখানা) কতিাটির ৩য় পঙ্‌ক্তি মূলে ছিল—

La gran Paloma fo'sil del jura'sico

The Great bird fossil of the jurassic period— (Robert Marquez-এর অনুবাদ)

জুরা পাহাড়ের বিরাট পাখির ফসিল—শঙ্খ (R. M. এর অনুবাদ)

একটু আলাদা নয় কি?

আর একটি পংক্তি—

ma scaras rituales de forma anitiaerolitica

ritual masks of the anti-atmospheric type,

আনুষ্ঠানিক মহাশূন্যের মুখোশ— শঙ্খ

'Angela Davis' আনুষ্ঠানিক কবিতাটির অনুবাদ মোটের ওপর সুন্দর, মূলানুগ, কবিতার স্পিরিটটা ধরা পড়েছে ঠিকই। তবে rustproof impulse 'অমলিন তোমার আবেগ' বললে স্বাদের বদল হয়ে যায়, যেমন হয় a la intemperie (যার অর্থ outdoor কে unsheltered বা 'দিশেহারা বাতাস' করলে।

pertences

a esa clase de suenos en que el tiempo

siempre ha fundido sus estatuas

You belong to

that class of dreams in which time

has always forged its statues– R.M. এর অনুবাদ

এর অনুবাদ শঙ্খবাবু যখন করেন—

''আছো তুমি
স্বপ্নের ভিতর দেশে, যেখানে সময়
চিহ্ন রেখে যায় তার''

তখন অনেক কিছু হারিয়ে যায়।

'চিড়িয়াখানা' অংশের তুলনায় 'অন্যান্য কবিতা' অংশে রাজনৈতিক স্বর তুলনায় অপ্রচ্ছন্ন। এখানে কালো মানুষের বেদনা (ধাঁধা, আখ, নিউইয়র্কে এক নিগ্রোর গান) তেমনি উদাসীন মানবতার ওপর কশাঘাত (জবাব দাও তুমি) অনুবাদেও ধরা পড়ে। কোথাও লোকগীতি, লোকগাথার আবহ খানিকটা লোরকার ভঙ্কিতে (শোকে বাঁধা গিটার), কোথাও লোকজীবনের শব্দস্পন্দন (সেন্ সেমায় আ)। বাংলা কবিতায় তা সঞ্চার করে দেওয়া অত সহজ নয়। বিশেষ করে শেষোক্ত কবিতাটিতে শব্দ ও ধ্বনির সহোদরত্ব এবং ছন্দের দোলা যেভাবে আনা গেছে, তা নিঃসন্দেহে এক আদর্শ উদারহণ। এ যেন মূলের বিদ্যুৎদীপ্তিকে ভিন্ন ভাষায় সঞ্চারের দক্ষতা।''[১২]

ফরাসি সাহিত্য অনুবাদের ধারা বাংলায় অপ্রতুল নয়, অনুবাদক শঙ্খ ঘোষের বিচরণ প্রতুলের বিপরীতে। তাই ফরাসি কবিতা অনুবাদ অংশত সংখ্যায় অপ্রতুল, কিন্তু তাৎপর্যময়। জাক প্রেভ, পল এলুয়ার, পল রবসন, এইমে সেজেয়ার প্রমুখের কবিতা অনূদিত। জাক প্রেভের 'পারিবারিক', 'কন্‌ডাক্‌ট্‌র', 'বোকা', 'গান', 'হেমন্ত' কবিতা অনূদিত। 'বোকা' কবিতাটিতে আন্তরিকতার ছাপ স্পষ্ট—

''মাথা দিয়ে বলে 'না'
বুক দিয়ে বলে 'হ্যাঁ',
যা-কিছুকে সে বাসে ভালো, তাকে বলে 'হ্যাঁ'
'না' বলে শিক্ষাগুরুকে
...
আর তার পর শিক্ষাগুরুর বহু তর্জন সত্ত্বেও
খুদে যত সব প্রতিভাধরের হাসিঠাট্টার সামনে
নানারঙা চক দিকে
দুর্ভাগ্যের ব্ল্যাকবোর্ডে সে
এঁকে রাখে এক সুখের মুখচ্ছবি।''[১৩]

'পারিবারিক', 'গান', 'হেমন্ত' কবিতায় জীবন-প্রেম-ভালোবাসার কথা সফল অনুবাদকের ক্রিয়া-শিল্পের অনবদ্য নমুনা। অন্যদিকে 'কন্‌ডাক্‌ট্‌র কবিতাটির সঙ্গে শঙ্খ ঘোষের 'ভিড়' কবিতার

যোগ পরিলক্ষিত। 'কন্‌ডাক্‌ট্‌র' কবিতায়—

''চলুন চলুন
উঠুন
চলুন চলুন
আসুন উঠুন
বড়ো যে লোকের ভিড়
লোকের ভিড়
উঠুন উঠুন
...
উঠুন উঠুন
ভব্য হোন
ধাক্কা নয়।''[১৪]

অন্যদিকে 'ভিড়' কবিতায়—

''ছোটো হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
'সরু হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
'চোখে নেই? চোখে দেখতে পান না?
সরু হয়ে যান, ছোটো হয়ে যান—'

আরো কত ছোটো হব ঈশ্বর
ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালে।
আমি কি নিত্য আমার সমান
সদরে, বাজারে, আড়ালে?''[১৫]

'কন্‌ডাক্‌ট্‌র' কবিতায় পুরো কবিতা জুড়ে কন্‌ডাক্‌ট্‌রের কথা-অপমান আর 'ভিড়' কবিতা কথা-অপমানের সঙ্গে আত্মসন্ধান— এখানেই অনুবাদক শঙ্খ ঘোষ এবং কবি শঙ্খ ঘোষের অনন্যতা, মাধুর্য এবং সফলতা। সমানভাবে উচ্চারিত হতে পারে তাঁর 'রাস্তা', 'চাপ সৃষ্টি করুন' কবিতা। এছাড়াও আছেন পল এলুয়ার, পল সেজান, এইমে সেজেয়ার প্রমুখ। শঙ্খ ঘোষের অনূদিত কবিতাসমূহে মুখ্যত মানুষ-মানবতার অপমান, যুদ্ধকালের কথা বর্তমান। যথা এইমে সেজেয়ারের 'স্বদেশ ফেরা (অংশ)' কবিতায়—

''এই মানুষ আমার
একলা মানুষ, শাদার হাতে

বন্দী মানুষ
একলাই যে উড়িয়ে দেয় শাদা মৃত্যুর
শাদা চিৎকার...''[১৬]

এইমে সেজেয়ার— জন্ম ওয়েস্ট ইণ্ডিজে, লেখেন ফরাসীতে। এই কবি বিষয়ে সমালোচক লেখেন—

''ইউরোপ আর আমেরিকার সাহিত্যপাঠে অভ্যস্ত এদেশী পাঠকের কাছে তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্যকে পৌঁছে দেবার কাজে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণার কথা আজ আর অজানা নয়। সে উদ্যোগে হাত মিলিয়ে অনেককাল আগে শঙ্খবাবু এইমে সেজেয়ার-এর 'নিজের দেশে ফিরে আসা' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতাটি অংশত অনুবাদ করেন। সেজেয়ার মাতিনিক নামে একটি ছোট্ট দ্বীপের রাষ্ট্রনেতা, 'নেগ্রিচুড' নামে কালো মানুষদের আন্দোলনের উদগাতা, লুবুম্বার জীবন নিয়ে লেখা একটি নাটক ও উল্লিখিত কবিতাটির জন্য স্মরণীয়। ইংরেজি থেকে অনূদিত এ কবিতায় গদ্যছন্দের স্পন্দন, পরাবাস্তবময় অসম পঙ্‌ক্তিবিন্যাসে আছে 'লাল পৃথিবী রক্ত পৃথিবী ভাই পৃথিবীর'র শাদার হাতে বন্দী মানুষের কথা।''[১৭]

অনুবাদ প্রকৃতপ্রস্তাবে কেবলমাত্র অনুবাদ নয়, অনুবাদ অনুবাদকের সত্তার প্রকাশ হয়ে ওঠে; কেবলমাত্র ভাষান্তর নয়— আন্তরভাষ্য। মূল কবিতার সঙ্গে অনুবাদকের সংস্কৃতি কখন যেন বিশ্বাসীভাবে মিলে গিয়ে অনূদিত কবিতা হয়ে ওঠে প্রাণময় এবং তাতে অনুবাদক নিজেকে আবিষ্কার করেন বিনীত উপায়ে। অনুবাদক শঙ্খ ঘোষের ক্ষেত্রে তদেব কথামালা স্মরণীয় এবং তিনি যেহেতু যথাযথ আবেগী-স্পর্শকাতর, সেইহেতু তাঁর অনুবাদ শিল্পকর্মও স্পষ্টতই স্পষ্ট। তাঁর অনুবাদ সূচীতে ইংরেজি কবির সংখ্যা দুই— টি.এস. এলিয়ট এবং ডিলান টমাস। টি.এস.এলিয়টের 'দ্য ড্রাই স্যালোয়েজেস' একটি দীর্ঘ কবিতার অনুবাদ পরিলক্ষিত হয় এবং তাতে—

''মাঝে মাঝে মনে হয় কৃষ্ণও কি তা-ই বলেছেন—
অন্য সব, তার মধ্যে এত্ত এক— কিংবা একই কথা ঘুরিয়ে বলার ভিন্ন রূপ—
ভবিষ্যৎ যেন কোনো মুছে যাওয়া গান, রাজসী গোলাপ, অগুরুছটায়
তাদের সবার জন্য পরিতাপ, শোচনার জন্য যারা এখানে নেই,
না-খোলা পুঁথির কোনো হলুদ তুলোট পাতা চাপা।''[১৮]

টি.এস. এলিয়টের 'ফোর কোয়ার্টেটস' কাব্যগ্রন্থের একটি অন্যতম কবিতা। কাব্যগ্রন্থের চারটি কবিতাই পাঁচ অংশে বিভক্ত এবং তাতে খ্রীস্টীয় ধর্ম-ভাবনা, গীতার আশ্বাসবাণী, দান্তের পারাডিসোর সুরের সঙ্গে বর্তমান সময়ের অস্থিরতা এবং জীবনের তাৎপর্য ওতোপ্রোতভাবে অঙ্কিত। টি.এস. এলিয়টের কবিতাটির শুরু—

"I do not know much about gods; but I think that the river

Is a strong brown god — sullen, untamed and intractable,
Patient to some degree, at first recognised as a frontier;
Useful, untrustworthr, as a conveyor oc commerce;
Then only a problem confronting the builder of bridges.
The problem once solved, the brown god is almost forgotten
By the dwellers in cities — ever, however, implacable,
Keeping his seasons and rages, destroyer, reminder
Of what men choose to forget. Unhonoured, unpropitiated
By worshippers of the machine, but waiting, watching and waiting.
His rhythm was present in the nursery bedroom,
In the rank ailanthus of the April dooryard,
In the smell of grapes on the autumn table,
And the evening circle in the winter gaslight.''[১৯]

শঙ্খ ঘোষের অনুবাদে—

''দেবতার কথা আমি জানি না বিশেষ; শুধু যেন মনে হয় এই
নদী এক সমর্থ ধূমল দেব, অনম্য, অনাব্য, ক্রোধী,
কিছুদূর সহ্য করে সব, প্রথমে তো মনে হয় সীমাপট;
উপযোগী, কিন্তু নির্ভরতাহীন বাণিজ্যবাহিনী;
তার পরে একমাত্র দুরূহতা জানে শুধু সেতুর নির্মাতা।
কিন্তু একবার নিটে গেলে ধূমল দেবকে ভূলে যায়
ভোলে সব জনপদবাসী— যদিও সতত অস্থিরতা
তার কাল স্থির রাখে, আক্রোশে বিনাশে ঠিক স্থির রাখে স্মৃতি
সকলে যা ভুলে যেতে চায়। অমানিত, সে অন্তত থেকে যায়
যন্ত্রপূজারীর কাছে, তবু সে প্রতীক্ষা করে, দেখে, চেয়ে থাকে।
শিশুর ঘুমের ঘরে স্পন্দ তার জেগে ছিল ঠিক,
এপ্রিল-দুয়ারপ্রান্তে এলেন্থাস সারিতে সে ছিল
কিংবা আঙুরের ঘ্রাণে হেমন্তটেবিলে
আর ছিল সন্ধ্যাবেলা গ্যাসের আলোর বৃত্তে শীতে।''[২০]

অনুবাদে কোথাও কোন কবিতার ধ্বনিপ্রবাহ ও শব্দঝংকারে বাধাপ্রাপ্ত হয়নি, লয় যথাযথ। ডিলান টমাসের 'ছিল কি এমন দিন' কবিতাটির ভাববস্তু জীবনানন্দ দাশের 'অদ্ভুত আঁধার এক' স্মরণীয়

হয়ে ওঠে।

কেবলমাত্র ইউরোপ বা আমেরিকার সাহিত্যের অনুবাদ নয়, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কবিতার কবিতা অনূদিত করেছেন শঙ্খ ঘোষ। চীনের তু সুঅং, সু তুং পো এবং জাপানের রিয়ুচি তামুরার কবিতা অনূদিত। তু সুঅং 'দুটি কবিতা'-এর দ্বিতীয়টিতে সময় সমাজ এবং সমাজের 'ঝানু- বড়োকত্তা-মেজোকত্তা'দের কথা হালকা ব্যঙ্গে উচ্চারিত। অন্যদিকে সু তুং পো-এর কবিতাটি অনুবাদে অনবদ্য এবং তাৎপর্যময়ভাবে মন্ত্রীকথা বিস্তারিত হয়েছে—

''ছেলেপুলে হলে সকলে চায়
খোকাটির বুদ্ধিসুদ্ধি হোক
সে-রকম বুদ্ধিতে গোটা জীবনটাকে ধ্বসিয়ে দিয়ে।
আজ আমি ভাবি
আমার ছেলেটি যেন হয়
একেবারে আকাট মুখ্য।
কেননা, তাহলে শান্তি নেমে আসবে তার জীবনে
আর, একদিন হয়তো হয়ে উঠবে ক্যাবিনেট মন্ত্রী!''[২১]

অনুবাদক শঙ্খ ঘোষের অনূদিত কবিতাসমূহ মূলত প্রতিবাদের— সত্যবোধ, প্রেম-ভালোবাসা এবং মানবতার কথার। এই হেতু ভিয়েৎনামি লোক সংগীতের সঙ্গে সাঁওতালি কবিতা, হো চি মিন এবং নিকোলাস গ্যিয়েন, চেরাবাণ্ডারাজু, গুন্টার গ্রাস, জুসেপ্পে উনগারেত্তি, জাক প্রেভের, আনা তাখমাতোভা, ডেভিড দিয়োপ, রিয়ুচি তামুরা, পাবলো নেরুদা, হুয়ান রামোন হিমেনেথ পাশাপাশি উচ্চারিত হয়। রিয়ুচি তামুরা—

''দূর থেকে ভেসে আসে স্বর
অনেক দূরান্ত থেকে ভেসে আসে স্বর
যে-কোনো গুঞ্জনের চেয়ে নিচু
যে কোনো আর্তির চেয়ে বড়ো
ইতিহাসের সাগরতল থেকে অনেক গভীর...''[২২]

—'তিন স্বর' কবিতার ভেতরের নিরেট আর্তি ব্যক্তি-স্বর অতিক্রম করে বিশ্ব-স্বর অথবা ব্যক্তি-বিশ্বস্বর এক ভিন্নতর উচ্চতায় পৌঁছে যায়, যেখানে কেবলমাত্র নিজের নিজেকে শোনা যায়।

''তিন স্বর' কবিতায় এক অংশ, আত্মস্থ হয়ে এই স্বর হয়ে উঠেছে তামুরা নিজেরই কোনো গভীরতর স্বর, যা 'যে-কোনো গুঞ্জনের চেয়ে নিচু, যে-কোনো আর্তির চেয়ে বড়ো।' একই সঙ্গে গুঞ্জনের চেয়ে নিচু আর আর্তির চেয়ে বড়ো বলতে কতদূর যে বোঝায় তা যেন আমরা ধরতে পারছিলাম তাঁর কবিতাপাঠের

আয়োজনের দিনে, সংকুচিত মানুষটি তাঁর পড়বার মুহূর্তে স্তরে স্তরে খুলে
যাচ্ছিলেন যখন, আর মুহূর্ত পরেই আবার যখন সংবৃত করে নিচ্ছিলেন নিজেকে।''[২৩]

পূর্বালোচিত যে, শঙ্খ ঘোষ অনূদিত কবিতাসমূহ মূলত প্রতিবাদের— মানুষ, মানবতা এবং বিপ্লব স্পন্দিত। তবে উচ্চকিত রাজনীতি, উঁচু স্বর বা প্রসঙ্গের অতিরেক বা কারুকৃতিযুক্ত কবিতা অনূদিত হয়নি। অনূদিত 'ভিয়েৎনামি লোকসংগীত'— 'বেন হাই নদীর বিলাপ'—

''এপার থেকে ওপার সে তো শুধু শতেক গজ,
কে রেখেছে আড়াল করে সেতু?
দু-তীর জুড়ে ঝরে হৃদয়! শয়তানকে ঘৃণা—
তত আমরা পরস্পরের ভালোবাসার হেতু।
...
বুকে কেমন বাজে!
নির্ঝরও বা শুকোয় যদি, পাহাড় যদি খসে
হৃদয় তুব স্থির,
ভালোবাসার দায় আমাদের নিরবধির প্রেম।
শত্রু যদি হঠাৎ নদী দুভাগ করে যায়
এক সাগরে ছুটবে ধারা মিলনমোহনায়।''[২৪]

সংগীতটির ফুটনোটে লিখিত— 'এই নদীটি উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মধ্যবর্তী অস্থায়ী সীমারেখা'। সহজেই অনুমেয় হয়ে ওঠে অনুবাদের হেতু এবং স্পষ্ট হয় একজন কবির অন্তরের যন্ত্রণা, ভালোবাসা— অন্তরের স্পর্ধা। ফলত অনুবাদকের অনূদিত কবিতাসমূহ হয়ে ওঠে 'অনুসর্জন'— সৃজনের আনন্দ-বিরহ-যন্ত্রণা-সময়-সমাজ-আত্মসমালোচনা সমৃদ্ধ। অনূদিত হয় হো চিন মিনের 'জেলখানার ডায়েরি'র কবিতাসকল। ভিয়েৎনামের কিংবদন্তীসম জননায়ক হো চি মিন নানা সময়ে জেলে বন্দী ছিলেন— বন্দীদশা তাঁর স্বপ্ন কবিতা প্রত্যয়ের অবস্থানকে বন্দী করতে পারেনি। একদিন যে কবির মুগ্ধতা ছিল প্রকৃতির রূপে এখন সেই কবির ছন্দ 'ইস্পাতে টান-টান'। সকাল-চাঁদ-সূর্য-আলোর কথা এমনভাবে উচ্চারিত হয় তা মূলানুগ হয়েও সর্বজনীন।

"I've never been fond of chanting poperty;
But what else can I do in thraldom?
These long days I'll spend composing poesy :
Singing poems may help in the wait for freedom."[২৫]

শঙ্খ ঘোষের অনুবাদে—

''কবিতা আমায় কখনো এমন মাতিয়ে রাখেনি আগে

কিন্তু এখন বন্দীদশায় কী আর করতে পারি?
শ্লোক গেঁথে দীর্ঘ সময় কেটে যাবে, ভাবি আজ
কবিতা হয়তো সহায় আমার মুক্তি-প্রতিক্ষারই।''[২৬]

বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় বিশ্বপট বা সাহিত্য যতখানি অঞ্চল জুড়ে, ভারতীয় সাহিত্যের পট কী ততটা উন্মোচিত? না কি সাগরের ওপার নিয়ে আত্মতৃপ্তির গণ্ডির ভেতরে নিজেদের বেঁধে রাখতে পেরেই যারপরনাই খুশি? শঙ্খ ঘোষের চেতনা পশ্চিম জগতের আধুনিকতায় যেমন, তেমনি ঘুরে বেড়াতে চায় গোটা ভারতবর্ষের দশদিকে — তাঁর কাছে সাহিত্য-ঐতিহ্য হল সমগ্র ভারতবর্ষের সাহিত্যের সঙ্গে সমগ্র বিশ্বসাহিত্য। অনুবাদক হিসেবে সেই ধারণা স্পষ্ট করেন আরও বেশি আন্তরকিতার সঙ্গে; অনুবাদ করেন— টি.এস. এলিয়ট, ডেভিড দিয়োপ, বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট, গুন্টার গ্রাস, নিকোলাস গ্যিয়েন, পাবলো নেরুদা, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, আনা আখ্‌মাতোভা, হো চি মিন, মার্গারেট অ্যাটাউড, সু তুং পো, রিয়ুচি তামুরা, চিনুবা আচিবে, জুসেপ্পে উনগারেত্তি এবং সঙ্গে চেরাবাণ্ডরাজু, ইকবাল, গিরিশ কারনাড। সংযোজিত হয় সাঁওতালি কবিতা। চেরাবাণ্ডরাজু— তেলেগু এই কবি-বিপ্লবী জনগণের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ; তাঁর কবিতা এবং আন্দোলন সমার্থক। মানুষের বাঁচার কথা লিখতেন বলে রাষ্ট্র দ্বারা উৎপীড়িত! এই সংগ্রামী কবির একাধিক কবিতা অনূদিত করেন অনুবাদক শঙ্খ ঘোষ। যথা— 'কী আমাদের জাত', 'আমাদের গ্রাম', 'পরিণাম', 'পিছনে ফেলে', 'তুমি আমাদের', 'নতুন প্রজন্মের কাছে', 'বন্দে মাতরম', 'আমাকে উঠতে দাও সাক্ষীর কাঠগড়ায়'। বিষয়সমূহ মূলত—আত্ম-আত্মসংকট, রাষ্ট্রের প্রতি প্রশ্ন, বিশ্বাস এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা।

''মানুষ তো তার আশা দিয়ে থাকে ঘেরা।
কথা না বলতে দেয় যদি হুজুরেরা
জেনে নাও সেই অসহায় সত্যকে—
এই সরকার এই শঠ-প্রতারকে
আস্থা রেখো না, এ তো বাঁচা নয় ভাই—
তুমি আমাদের, তুমি অমাদেরই লোক।''[২৭]

—রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পুলিশ, রাষ্ট্রের সহযোগিতায় ফুলে ওঠা 'বিলাসব্যসনে' দিন কাটানো ভোগ-সর্বস্ব মানুষের প্রতি প্রশ্ন আর প্রশ্নবাণ তাঁর কবিতার পরতে-পরতে। কেবলমাত্র রাষ্ট্র নয়, আত্ম-আত্মসংকটের কথাও উচ্চারিত—

''কী আমাদের জাত, আর ধর্মই বা কী
ভেজা জমির ওপর যখন লাঙল চালাচ্ছি
কণামাত্র খাবার যখন পাই না খেতে নিজে

পাথর দিয়ে মূর্তি বানাই কড়া রোদের নীচে।''[২৮]

—উচ্চারিত ধর্ম, জাত— আর এইসবকে পাশে রেখে খাদ্যের অভাবের কথা। তবে আশার কথা প্রতি মূহূর্তে-মূহূর্তে— 'ঘাম ঝরিয়ে এক হয়েছি, মেলাচ্ছি সব হাত।' শঙ্খ ঘোষের গদ্যছন্দে নতুন প্রজন্মের সুস্থতা ও দায়বদ্ধতার চিত্র অনন্যসাধারণ—

> ''এই আমার প্রজন্মকে বইতে হচ্ছে বিরাট এক ভার, কোনো দেশেই যা/বয়নি কেউ আগে, এদেশেই বয়নি কোনো আশাবাদী আর,/ যে ভার কখনো নামানো যায় না, বোঝানো যায় না লিখে/এমনই সে ভার!/এই আমার প্রজন্ম কেবলই এগিয়ে চলে ঠিক আর যথাযথ পথে.../ঠিক, এই আমার প্রজন্ম জানে এর সবই, খেলাপ করে না তার কথার।''[২৯]

শঙ্খ ঘোষের অনুবাদে যে flexbility তা যেমন অতুলনীয় তেমনি ছন্দ, শব্দ চয়ন, চিত্রকল্পের মেলবন্ধন, প্রত্যয় স্বাভাবিকভাবে অনন্য মাত্রা পায়।

''বহুল দেবতা বহু স্বর' (১৯৮৬)-এ কিছু সাঁওতালি কবিতার অনুবাদ জায়গা পায়। অনুবাদের সংখ্যা দশ— লাগ্‌ড়ে সেরেঞ্চ, পাতা সেরেঞ্চ, দঙ্‌ সেরেঞ এবং সহরায় সেরেঞ পর্যায়ে দশটি 'সাঁওতালি গান'। প্রকৃতি আর মনের উত্তাপ, সরলতা আর উচ্ছলতা, শ্রাবত্য আর দৃশ্যতা— সবমিলে 'সাঁওতালি গান' মূলের ছন্দে দোলয়িত এবং কবিতাগুলি বাংলা কবিতার মতো, আড়ষ্টতাহীন।

> ''ছোট্ট আমার বোন যখন ছিল আমার পাশে
> টগর গাছের নীচে ছিল খেলায় খেলায় ভাই
> টগর গাছের নীচে ছিল খেলায় খেলা
> ছোট্ট আমার বোনকে আজ নিল রে কোন্‌ দেশে
> টগর গাছের নীচে এখন শুন্‌শান্‌ রে ভাই
> টগর গাছের নীচে এখন সমস্ত শুন্‌শান্‌।''[৩০]

অনুবাদক শঙ্খ ঘোষ জোরের অথবা ফরমায়েশের অনুবাদক নন, তিনি হৃদ্য-টানের অথবা আন্তরিক অনুবাদক অর্থাৎ 'অনুবাদ আমাকে করতেই হতো'-এর। স্বীকারোক্তি অপরিহার্য যে, আর সেই অনুবাদে মূলের পাশাপাশি নিজের ভাষার স্ফুরণময় পাঠযোগ্যতার সঙ্গে মৌলিক সত্তার যোগ ঘটান। তবে শিল্পময়-সত্য উচ্চারণের কবি অনুবাদকের ভূমিকাতেও সেই সত্তারই প্রকাশক— তাঁর অনূদিত কবিতাসকল মূলত মানব-প্রেম-প্রতিবাদ কেন্দ্রিক অনাটকীয়। তাই এই ধারায় সাঁওতালি কবিতা, ভিয়েৎনামি লোকসংগীতের সঙ্গে হো চি মিন, নিকোলাস গ্যিয়েন, চেরাবাণ্ডারাজু, বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট, গুন্টার গ্রাস, পাবলো নেরুদা, চিনুবা আচিবে প্রমুখের কবিতার নিকট গ্রহণীয় হয়ে ওঠে সমগ্র ইরাকের কবিতা— ''ইরাকি কবিতার ছায়ায়'' (২০১০)। হঠাৎ ইরাকি কবিতার অনুবাদ

কেন? এই জিজ্ঞাসার উত্তর এবং নেপথ্য— ২০০৩ সাল, বুশ-ব্লেয়ারের ইরাক-অভিযান; আধুনিকতম অস্ত্রে অগণিত মৃত্যু— ধ্বংস আর ধ্বংসাবশেষের ভিড়; শবযাত্রা— এরকম দীর্ঘশ্বাসে ভরা দিনে অন্তঃশায়ী বিষাদ আর প্রবহমান ভালোবাসা-প্রেমের টানে, ব্যক্তি-স্মৃতি-বিশ্ব-পুরাণ ভাবনার যোগে 'ভিন্ন দেশ ভিন্ন সংস্কৃতি ভিন্ন ইতিহাস, তবুও কোথাও কোথাও যেন ব্যথাছবিতে নিজেরই দেশীয়তার সঙ্গে একটা যোগ তৈরি হয়ে যায় আমাদের।' অনূদিত হয় ইরাকের কবিতা— পঁচিশজন কবির ষাটটি কবিতা। বদর শাকির আল-সয়াবের 'বৃষ্টির গান', 'বৃষ্টিবিহীন শহর'; নাজিক আর-মালাইকার 'প্রেতেদের প্রার্থনা', 'নববর্ষ'; আবদুল ওয়াহাব আল-বয়াতির 'আর্নেষ্ট হেমিংওয়েকে', 'হ্যামলেট', বিচ্ছেদ আর মৃত্যুর কবিতাবলী', 'জিপসির গান', 'ফেরার', 'ছোটো বক্তৃতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা', 'বাস্তুহারা আরব'; বুলান্দ আল-হায়দারির 'পথের বাঁকে কথাবার্তা', 'ক্ষমার্থী', 'নিহত সাক্ষী', 'ডাকহরকরা'; শাজিল তাকার 'সিন্দবাজের গান'; লামিয়া আব্বাস ইমারার 'গণৎকার যদি বলত আমায়'; আকরাম আল-উইত্রির 'পেরিয়ে এলাম সাঁকো', 'বিষণ্ণ বাগদাদ'; আবদুর-রজ্জাক আবদুল-ওয়াহিদের 'আগুন-ফোয়ারা'; মোহম্মদ জামিল শালাশের 'বাড়ি থেকে দূরের রাতে প্রেমের গান; আলি আল-হিল্লির 'লাতাকা কাকে', 'কাফে শার্‌দাগ'; সাদি ইউসুফের 'শাত্ ইল-আরব', 'শোকগাথা', 'কোথায়?', 'ঘর', 'বিজলি', 'বন্দুক'; রুশদি আল-আমিলের 'দুটি কবিতা', 'দৈনন্দিন ছবি'; ইয়াসিন তাহা হাফিজের 'সার্‌হান', 'বাকুবা', 'স্বপ্ন', 'নেকড়ে'; সামি মাহ্‌দির 'একটি দুর্ঘটনা', 'আমার বাবার জ্ঞান হলো', 'সয়ীদ', 'খুনে'; মে মুজাফফরের 'যা হারিয়ে গেছে', 'ছোটো গল্প'; মালিক আল-মুত্তালিবির 'অনেকানেক পতন'; আবদুল-আমির মুয়াল্লার 'দুই রাত', 'জাগো!'; আলি জাফর আল-আলাকের 'সম্পর্কের শেষ', 'বিদায়'; মা'দ আল-জুবুরির 'গ্রীষ্মের জন্য বিরাম', 'আমার বন্ধু আবদুল ওয়াহাবের জন্য বিরাম'; আমজাদ মোহম্মদ সয়ীদের 'প্রতিদিন'; ফারুক সালুমের 'ইচ্ছাপত্র', 'যুদ্ধকালে কাফে', 'দিনের খুঁটিনাটি'; সাইদা আল-মৌসবির 'তোমার দিকে পথ', 'বীর', 'আহত'; খজল আল-মাজিদির 'মহিমার ডালপালা', 'একটি শাখা, বন্ধু!'; ফারুক ইউসুফের 'মাছ', 'প্রতিভা বিষয়ে' এবং আদ্‌নান আল-সাইঘ্‌ের '১৯৮৫ সালের জন্য'। দ্রষ্টব্য এই যে, কবি বদল শাকির আল-সয়াবের কবিতা ব্যতিত অন্যান্য কবিদের কবিতা বয়সানুক্রমে সাজানো।

''আমার সিসায় ঠাসা বুক
নারকী ফোয়ারা, তুমি নিয়ে গেছ এই স্বর;
বসন্তে হাজার ফলা তুলে দিয়ে গেছ তুমি আমার ভিতরে,
দংশনচিৎকার ছাড়া আর সবকিছু আজ হারিয়ে গিয়েছে
কোনোই প্রলেপ নেই ক্ষতে
পৃথিবীর সব জল মুখে নিয়ে শান্তি নেই তবু।

আমরা সিসায় ঠাসা বুক।
জল নেই। ঠোঁটে শুধু হাজার হাজার পাত্র ছোঁয়া,
তুমি কূপ আর আমি মাটিকে ব্যথিয়ে তুলি অতল অবধি,
আর জল,
জলের শপথ মনে রেখে
আমি শুধু মুখে ভরি বালি
পড়ে যাই নীচে
ঝরে পড়ে সমস্তই, ঝরে পড়ে যায় সব জল।''[৩১]

অথবা—

''কোথায় চলেছে ওই যুবা
এমন এক অদ্ভুত সন্ধ্যায়?
জলের জন্য একটা ফ্লাস্ক
আর বেল্টে লটকানো একটা বোমা
আর যে-অস্ত্র কখনো সে ছাড়ে না...
ও কি সাগরের দিকে চলেছে?
এই যুবক...''[৩২]

—কেবলই যুদ্ধের কথা! ধ্বসের ধ্বংসস্তুপ— জীবন থেকে সরে যাওয়া জীবনের কথা অথবা জলের! প্রতিরোধ আছে, আছে প্রতিবাদ— কিন্তু যুদ্ধের রকমফেরে অথবা শাসকের অস্ত্র-চালনায় চালনায় প্রেম-ভালোবাসা-মমতা-স্নেহের আকাশ-বাতাস ভরে উঠেছে বারুদের গন্ধে, রাসায়নিক আক্রমণে, মৃতদের দেশে! ইতিহাস যে-রকম— তিরিশের দশকের গোড়ায় স্বাধীনতা লাভ করে ইরাক। অতঃপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত! যুদ্ধশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র না সোভিয়েত ইউনিয়ন— কোন শিবির পাবে ইরাককে? তারপর দখল-উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্বময় যাত্রা। প্রতিবেশী দেশ ইরানে আরেক রকমের সংঘাত এবং ইরাকের সঙ্গে রাসায়নিক যুদ্ধ! অনেক ক্ষয় অনেক মৃত্যু। বাইরের আক্রমণ ভেতরের নিরন্তর বিক্ষোভ— এই অবস্থায় নিষিদ্ধ অস্ত্রের গোপন ভাণ্ডারের অজুহাতে আমেরিকা আর ইংল্যাণ্ডের বুশ আর ব্লেয়ার— ২০০৩ সালের ২০ মার্চ শুরু করেন উপসাগরীয় হামলা। অতঃপর সাদ্দাম হোসেনকে বন্দী করা এবং ২০০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসি— তারপরেও চলমান সন্ত্রাস আর অন্তর্ঘাতের নিরন্তর পরম্পরা। অনুবাদক ভুমিকাংশে লিখেছেন—

''কবিতাগুলি যাঁরা লিখেছেন, আমাদের প্রায় সমকালীন তাঁরা। জন্মকালের হিসেব

নিলে বলা যায়, যেন রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী থেকে জয় গোস্বামী পর্যন্ত বিস্তৃত সেই সময়। তবে, যে-কবিতাগুলির এই অনুবাদ, ১৯৫৩ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত এই পঁয়ত্রিশ বছর মাত্র তার প্রসার। যে-যুদ্ধের ছবিটার কথা গোড়ায় লিখেছি, তার সঙ্গে এর কোনো যোগ থাকবার কথা নয় তাহলে। অথচ, কবিতাগুলি পড়তে পড়তে অনেকসময়ই সেই যোগটা হানা দিতে থাকে আমাদের মনে, কেবলই এখানে আসে যুদ্ধের কথা, ধ্বংসের কথা, প্রতিরোধের কথা। কেননা, এই কবিরা তাঁদের কবিজন্মের সূচনা থেকেই দেখে আসছেন এই সব যুদ্ধেরই রকমফের, কেবলই অভ্যুত্থানে ভরে থেকেছে তাঁদের কালের পতনবন্ধুর সংকটময় ইতহাস। এঁদেরই মধ্যে একজন কবির একটি কবিতা-বইয়ের নাম যে 'প্রেম, মৃত্যু আর নির্বাসন', তা নিছক আকস্মিক নয়। ওই নামটিই হতে পারত গোটা আধুনিক ইরাকি কবিতার যথার্থ শিরোনাম। ব্যক্তি হয়ে উঠতে চেয়েছেন এই কবিরা, ব্যক্তিগত প্রেমেরই কবিতা তাঁর লিখতে চেয়েছেন বারে বারে, কিন্তু দশকে দশকে তাঁদের কেবলই যেতে হয়েছে মৃত্যর অথবা নির্বাসনের ধারাবাহিক লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে।''[৩৩]

লেখা হয়—

''স্বপ্ন দেখলাম যে আমি এক ফেরার
লুকিয়ে আছি জঙ্গলে।
দূর এক দেশের নেকড়েরা
কৃষ্ণমরুর মধ্য দিয়ে রূঢ় পাহাড়ের ওপর দিয়ে তাড়িয়ে বেরিয়েছে আমাকে।
প্রিয়, আমাদের বিচ্ছেদ ছিল এক অত্যাচার।
স্বপ্ন দেখলাম যে আমার কোনো ঘর নেই,
একটা অচেনা শহরে মরে যাচ্ছি আমি,
মরে যাচ্ছি একা, প্রিয়, গৃহহারা।''[৩৪]

অথবা—

''তোমার আমার মাঝখানে আর কোনো কিছু নেই প্রিয়
এমন কুয়াশা আর
প্রিয়জনদের দারুণ ব্যথা বা
মরুদ্যানের মরুভূমিগুলি ছাড়া।

চলে যেতেই তো এসেছিল, বাছা...
তারপরে শেষ এই গল্প যা কখনো বলেনি বই।

চলে যেতেই তো এসেছিল, আর
আমরা সকলে কুয়াশায় ঢেকে রই।''[৩৫]

চেতন-অবচেতন-সমাজসংকট-আত্মসংকটে-'মরে যাচ্ছি একা, প্রিয়, গৃহহারা'! কোন ঘর নেই, জঙ্গলে অবস্থান— দূর দেশের নেকড়েদের তাড়া! ফেরার। চারদিকে যখন বিসংগতির চিত্র এবং অতর্কিত আক্রমণ তখন কবি 'ফেরার' একই সঙ্গে ভেতরে বাইরে। অনুবাদক শঙ্খ ঘোষের কবিতা নির্ণয় এবং অনুবাদের সংযম, শোভনতা, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য অনন্য মাত্রা পেয়েছে এইসব কবিতায়। স্মরণীয় যে, কবিতারাশি মূলত তৃতীয় ভাষা থেকে অর্থাৎ 'Yasin Taha Hafia (ed.), Modern Iraqi Poetry, Dar al-Ma'mun, Baghdad, 1989' এবং 'Abdullah al-Udhari (ed.), Modern Poetry of the Arab world, Penguins, 1986' ইংরাজি অনুবাদ থেকে অনূদিত। স্বাভাবিকভাবে কবিতা ভাষান্তরের ভার সহ্য করতে অপারগ, তার উপরে যদি তৃতীয় ভাষা থেকে হয় তবে মূল থেকে দূরত্ব বাড়ে বৈ কমে না। এইবেলায় শঙ্খ ঘোষ সচেতন এবং সফল। নামকরণের বেলাতেও— ''ইরাকি কবিতার ছায়ায়''।

''ভদ্রমহোদয় ভদ্র মহোদয়েরা
আমার কথা খুব অল্পই
বিচ্ছিরি লাগে শব্দগুলি আমার সময় খেয়ে নিলে।
আমার জিভ
কাঠের তলোয়ার নয়।
আমার শব্দগুলি, মহোদয়াগণ, একেবারে সোনালি,
আমার শব্দগুলি, ভদ্রমহোদয়েরা, রোষের আঙুর।
মাতাল নই আমি, শুধু একটু ক্লান্ত।
মোমগুলি নিভে যায়
আরো বেশি ঠাণ্ডা হতে থাকে রাত
হাজার হাজার বিশ্বাসঘাতকতা আর সস্তা মিথ্যের মধ্য দিয়ে।
ব্রিফকেসে আমি বয়ে চলি আমার হৃৎপিণ্ড
মৃত একটা শিশুর মতো।
সিজার নই আমি :
হাজার হাজার বিশ্বাসঘাতকতা আর শস্তা মিথ্যের মধ্য দিয়ে
চুপসে যাচ্ছে আমার মন।
বিদায়।
ভদ্রমহোদয় ভদ্রমহোদয়াগণ।''[৩৬]

অনুবাদকের অসহায়তার সঙ্গে অথবা বিপরীতে কবির অসহায়তার সঙ্গে অনুবাদকের অসহায়তা সমান্তরিত হয়— ব্যথাময় যোগের কথা উচ্চারিত হয়। অন্য একটি অনুবাদে—

> ‘‘আমার রক্ষীরা হলো অন্ধ ঘাস,
> উদ্‌ভ্রান্ত ময়ূর,
> পচা আপেল খাবার লোভে উৎসুক ঘুঘু,
> মেঘের প্রান্ত দিগন্ত থেকে ছড়িয়ে-দেওয়া ধুলো।
> রক্ষীরা আসে আর যায়
> জলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে-যাওয়া তরুশাখার মতো।
> আর আমি, একটা মাছের মতো
> রক্ষীদের উপ্‌চে-পড়া ছায়ার মাঝখানে ঘুরতে থাকি।’’[৩৭]

অনুবাদক শঙ্খ ঘোষ যখন সমালোচক-কবি তখন তাঁর অনুধাবন সমগ্রকে নিয়ে— তাঁর চর্চা এবং চর্যার পরিসর বৃহৎ। তাঁর সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্রের সঙ্গে শিল্পসাহিত্যের নানা অবস্থা এবং জীবনের বহুমুখীনতার প্রতি দায়বদ্ধ মানুষ হিসেবে অন্যান্য ধারার গদ্য সমান্তরালভাবে উঠে আসে। আবার কবিতার ক্ষেত্রেও তিনি কোনরকমের পূর্ব-নির্ধারিত নন অর্থাৎ প্রেম-প্রতিবাদ-সমাজ-আত্ম সবকিছু একই সঙ্গে উঠে আসে। অনুবাদক হিসেবেও তিনি সমগ্রকে অনুবাদ করার পক্ষে অর্থাৎ ভিয়েৎনামের সঙ্গে চিন, জার্মান, আফ্রিকা, ফ্রান্স, আমেরিকা, স্পেন, ইতালী অনূদিত হয়। অনূদিত হয়— চেরাবাণ্ডারাজু, গিরিশ কারনাড, ইকবাল। তাঁর কথানুসারে, কালের দূরত্ব বা ভাষার দূরত্ব সত্ত্বেও যদি কাফ্‌কা, রিলকে, নেরুদা, ব্রেশ্‌ট অনূদিত হতে পারে; রবীন্দ্রচর্চার শেষ নেই— সেখানে তাঁর সমকালীন ভারতীয় মণ্ডল নয় কেন?

> ‘‘আমাদের রবীন্দ্রচর্চার তো শেষ নেই। সেই চর্চার নানা বৈচিত্রের মধ্যে একটা এই যে, অনেকসময়ই তাঁকে মিলিয়ে দেখা হয়েছে পশ্চিমদেশের একাল-ওকালের অনেক কবি-মণীষীর সঙ্গে, আর এরকম মিলিয়ে-দেখা বিচারে তাঁর বিষয়ে স্বচ্ছতর হয়েছে আমাদের অনেক পুরোনো ধারণা।
>
> কিন্তু এত বিচিত্র সেই মিলিয়ে-দেখার সময় আমরা কি রবীন্দ্রনাথের চারপাশে তাঁর সমকালীন ভারতীয় মণ্ডলকেও লক্ষ করেছি ততখানি? প্রায় একই সময়ে দেশের এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে যে-কবিরা তাঁদের কবিতার চর্চায় ছিলেন, তাঁদের সবার সঙ্গে সমপটভূমিতে মিলিয়ে নিয়ে কি রবীন্দ্রবিষয়ে ভাবতে চেয়েছি বিশেষ? সুব্রহ্মণ্য ভারতী তামিল ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের, এই তথ্য আমাদের জানা। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় চেতনার বিকাশের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে চাইবার সময়ে এটা আমাদের লক্ষ করবার বড়ো অবকাশ হয় না যে ভারতী-ই বা

কীভাবে যুক্ত ছিলেন সমগ্র সেই পটভুমির সঙ্গে। অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া আর তার শিল্প-রূপায়ণের কথা ভাবতে গিয়ে অল্পই আমরা টের পাই যে একেবারে অন্য এক প্রান্তে কুমারণ আসান কীভাবে মালয়ালম কবিতায় প্রকাশ করেছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতা, অনেকসময় প্রায় একই রকম বিষয়কে ছুঁয়ে। কিংবা, উলটো দিকে, যে-জালিয়ানওয়ালাবাগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে নাইটহুড ছাড়তে হলো, অমৃতসরেরই কবি ভাই বীর সিং-এর মনকে একেবারেই কেন ছুঁতে পারল না সেটা, আমাদের তা ভেবে দেখবার কোনো সুযোগ হয়ে ওঠে না।''[৩৮]

তাঁর ''ইকবাল থেকে'' (২০১২) গ্রন্থের 'অনুবাদের কথা' অংশে বলেন—

''জাভিদনামারই এই অনুবাদ, কিন্তু তবু ঠিক-ঠিক অনুবাদ বলা যাবে কি একে? মূলের সঙ্গে গোটাটা মিলিয়ে নিলেও সরাসরি মূল থেকে নয় বলে একটা দ্বিধা থেকেই যায়। বিশেষত, ছন্দে-মিলে এ-অনুবাদ মূলের অনুসারী নয়, শেখ মাহমুদ আহমদ বা আর্‌বেরি-র অমিত্রাক্ষর ইংরেজিরও নয়। ইকবাল তাঁর এই কাব্যটিতে ছন্দের বদল করেছেন মাঝে মাঝেই, টানা একই ছন্দে লেখা নয় তাঁর জাভিদনামা। সেই নজিরে, অনুবাদের ছন্দচালেও ঘটিয়েছি রকমফের। ত্রিবৃত্তেরই ব্যবহার আছে এখানে, মিল কখনো আছে কখনো নেই, কখনো পরস্পর কখনো-বা একান্তর। এসব কারণে, বইটির নাম জাভিদনামা বা 'শাশ্বতের গান' না রেখে 'ইকবাল থেকে' বলাই সংগত মনে হলো। অবশ্য, ওসব স্বাধীনতা নিলেও, ভাবনায় বা প্রতিমাবিন্যাসে যাতে দূরবর্তী না হয়ে পড়ে অনুবাদ, যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি তার।''

''ইকবাল থেকে'' (২০১২) মূলত ''জাভিদনামা'' (১৯৩২)-এর অনুবাদ। ''জাভিদনামা বা ঈশ্বরের গান'' এই নাট্যকাব্যটি দশটি সর্গে বিন্যস্ত— 'প্রার্থনা', 'সূচনা' : আকাশে', 'সূচনা : মর্তে', 'চন্দ্রমণ্ডল', 'বুধমণ্ডল', 'শুক্রমণ্ডল', 'মঙ্গলমণ্ডল', 'বৃহস্পতিমণ্ডল', 'শনিমণ্ডল' এবং 'মণ্ডলাতীত'। অনুবাদকের কথানুসারে ইসলামি ঐতিহ্যের মিরাজনামা আর দান্তের 'Divine Comedy'-এর মিলিত আদলে ইকবাল তাঁর ''জাভিদনামা'' নাট্যকাব্যে শাহ্‌নামা-এর ইতিহাস প্রবণতা আর রুমির আত্মিক আবেগ যোগ করেন। রচনাটিতে মানুষের চিরভাস্বর অন্তর্দাহের বেদনা, আবেগ- উৎসারণ, মানবাত্মার বিকশিত হবার পথ— দেখা, বোধময় দেখা এবং দ্বন্দ্ব, অনুকরণ আর সত্যধর্মহারা মানুষের উল্লাস, ইতিহাসের ভ্রষ্টাচারীদের কথা— মুত্যুও যাদের ছুঁড়ে ফেলতে চায়! অতঃপর মুক্তির স্বপ্ন, মরুপথের যাত্রী হয়েও যেভাবে সবার সঙ্গে মিশে চলতে হয়; একা হয়েও—

''মরুপথের যাত্রী তুমি, একলা চলো সবার সঙ্গে মিশে।
প্রভায় ভরা সূর্যের চেয়ে ভাস্বর এই আবির্ভাব তো তুমি

কাজের মধ্যে বাঁচো, আলোয় দাও ভরে দাও তুচ্ছতম ভূমি।
সিকান্দার বা কায়কোবাদ, দারিয়ুস আর খসরু সবাই গত
হাওয়ায় হাওয়ায় উড়তে থাকো ছোট্ট একটা ঘাসের ডগার মতো।''[৪০]

অনুবাদ বিষয়ে বিশিষ্ট লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সঙ্গে পত্রালাপে জানা যায় বইটি নামগ্রহণের সার্থকতা এবং বিফলতা ও সফলতার কথা—

''একটা কথা বলতে ভুলেই গেছি। আপনি যে লিখেছেন কবিতার কখনোই অনুবাদ হয় না, হয় এক ধরণের transcreation, সে কথা আমি বর্ণে বর্ণে মানি। সেইজন্যেই, ইংরেজি অনুবাদটির প্রতি শব্দেশব্দে অনুগত থাকবার চেষ্টা করেও, আমার এই লেখাকে অনুবাদ বলতে আমি দ্বিধা করি। 'ইকবাল থেকে' নামটিই যে সর্বত্র ব্যবহার করছি, তার একটা কারণ হলো এই। ইকবালের আভাস-মাত্র এতে পাওয়া যেতে পারে। যথার্থ ইকবালকে ধরবার কথাটা দুরাশা মাত্র।''[৪১]

এই সরল স্বীকারোক্তি স্বীকার করেও স্বীকার্য যে, বইটির অক্ষরে-অক্ষরে লেগে আছে অনুবাদকের পরিমিতিবোধ এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিয়ে ভাববার জন্য এখানে, 'মেলানো অর্থে প্রধানত বৈপরীত্যটাকেই লক্ষ্য করা।' অর্থাৎ সমগ্রের খোঁজ-সফলতা।

''Tagore en las barrancas de San Isidro'' (১৯৬১) রামোনা ভিকতোরিয়া এপিফালিয়া রুফিনা বা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর স্প্যানিশ ভাষায় লেখা বইটি শঙ্খ ঘোষ ''ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ'' (১৯৭৩) নামে অনুবাদ করেন। বইটি 'বিজয়ার অলিন্দে', 'সান ইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ' এবং 'অনুষঙ্গ' তিনটি অংশে বিভক্ত। 'বিজয়ার অলিন্দ' এবং 'অনুসঙ্গ' অনুবাদকের যুক্তাংশ আর ''Tagore en las barrancas de San Isidro'' বইয়ের অনুবাদ 'সান ইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ'— সমগ্র নিয়ে ''ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ''। বইটির 'বিজয়ার অলিন্দ' অংশে বিদেশিনী বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর এবং ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর অলিন্দে কীভাবে পৌঁছলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কীভাবেই-বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফিরে পাবেন তাঁর 'অনিষ্ঠ অবকাশ'— যুক্তি এবং আন্তরিকতায় বিস্তারিত। অন্যদিকে 'অনুষঙ্গ' অংশে আছে 'ভিক্টোরিয়া প্রসঙ্গে' এবং 'সূত্রাবলী'কথা। অনূদিত অংশ 'সান ইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ'— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে, কাম নয়। ভোগ নয়, মিলনও নয়, হয়ে ওঠে আনন্দের পীঠস্থান। 'খোলাপথের ধারে' ভালোবাসার এক অন্তহীন পথ উন্মোচিত হয় এবং বন্ধনের সমস্ত সীমা অতিক্রম করে উদ্‌ঘাটিত হয় সত্য। অল্প বয়সের সংকটকাল থেকে যেভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' সমস্ত অবিশ্বাসের ভিতস্থানে বিশ্বাস-ভালোবাসার স্পর্শ এনে দিয়েছিল— তারপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসা এবং কর্মে ও নীরবে গড়ে ওঠে পরস্পরের 'অলিন্দ'। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো বা বিজয়ার অলিন্দ আবার সেই অলিন্দ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও নিঃসংশয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের শেষ ২০-১৫ বছর দ্বন্দ্ব এবং নিঃসঙ্গতায় কেটেছিল অথবা বলা ভাল, এক-একজন শিল্পী মানুষ আজীবন নিঃসঙ্গ থাকেন— 'কী দুঃসহ নিঃসঙ্গতার ভার আমাকে বইতে হয়, তোমার পক্ষে তা ধারণা করা শক্ত হবে।' এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় সঙ্গ দেয় এবং সঙ্গী হয় বিজয়া। আর গড়ে ওঠে এক ভালোবাসার ইতিহাস— আত্মার ইতিহাস। ''ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ'' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওকাম্পো এবং ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ— পরিপূরক একটি বই। শঙ্খ ঘোষের অনুবাদের নির্মলতা এবং ধারাবাহিক পরিচ্ছন্নতা বইটির অমূল্য সম্পদ। অমূল্য সম্পদ 'বিজয়ার অলিন্দ' এবং 'অনুষঙ্গ' অংশ। বইটি অনূদিত হওয়াতে এই লাভ হয়েছে— ভালোবাসা কতটা পবিত্র আত্মার হতে পারে তা জানা হয়।

শঙ্খ ঘোষের কাছে অনুবাদ হল 'নিজস্ব ভাবে' পাওয়ার বিষয়। তাঁর অনুবাদে পাঠক অনুবাদের নিজস্ব স্বর এবং মূলকে পেয়ে যান আর তিনি নিজে অনুবাদে-অনুবাদে গড়ে তোলেন সংলাপ— সমগ্রের সংলাপ অথবা সমগ্র ঐতিহ্যের সংলাপ। এই ঐতিহ্যের পাঠ 'সহজ পাঠ'বেলা থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অবলম্বন করে বর্তমান থেকে অতীত— তা হয়ে উঠেছে এক সঞ্জীবিত প্রবাহ— মিশে গেছে সারা পৃথিবী। কবিতায় যেমন বিশ্ব এসে যোগ দিয়েছে কারু নরম পায়ে, নাট্যক্ষেত্রেও গিরিশ কারনাডের সঙ্গে হ্যাল্‌টের হাসেনক্লেভার। গিরিশ কারনাডের ''হয়বদন'' (১৯৮৬) এবং ''রক্তকল্যাণ'' (১৯৯৫); হ্যালটের হাসেনক্লেভারের ''মানুষ'' (২০১৪)।

গিরিশ কারনাডের ''হয়বদন'' (১৯৮৬)-এ লঘুগম্ভীর চালে সামাজিক জীবনের এক অনবদ্য গল্প ধরা আছে। অনুবাদক শঙ্খ ঘোষ মূলত ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন নাটকটি— কন্নড় থেকে নাট্যকার যা নিজেই করেছিলেন। অনেকদিন পরে কারন্থ-এর করা হিন্দি অনুবাদের সাহায্য নেন অর্থাৎ আরও একবার পড়েন— তবে অল্প দু-একটি সংশয়স্থান ছাড়া যেভাবে বদল ঘটাননি অনূদিত নাটকটির। অতএব, ইংরেজি এবং হিন্দি-এর অনুবাদ ''হয়বদন''। নাটকটির মূল বিষয়— গণেশের মুখোশ সামনে রেখে নাটকটির সূত্রপাত— অধিকারী এবং জুড়িদের গানের মধ্যে দিয়ে। অতঃপর এক ঘোড়ামুখোর প্রবেশ, কান্নাসহ পরবর্তীতে জন্মের বিবরণ আর একটাই প্রার্থনা—

> ''ললাট? ললাট! এ যদি আপনাদের মতো ললাট হতো সবই মেনে নিতে পারতাম। ভাগ্যকে মেনে নেবার বহু চেষ্টাই তো আমি করেছি। আমার ব্যক্তিগত জীবনে কোথাও কোনো খুঁত তো নেই। আমি দেশের সামাজিক জীবনে ভিড়বার চেষ্টা করেছি-রাজনীতি, স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ, ভারতীয়-করণ, সমাজতন্ত্র-সব-সবই কিছুকিঞ্চিৎ করেকম্মে দেখেছি। কিন্তু আমার সমাজ কোথায়? কোন্‌টা আমার সমাজ? অধিকারীমশাই, আমাকে পুরো মানুষ করে দিন, সম্পূর্ণ মানুষ। বলুন, কী

ভাবে হব? কী করতে হবে আমায়, বলে দিন। (দীর্ঘ নীরবতা। সকলেই ভাবিত।)''[৪২]

ঘোড়ামুখোর অপূর্ণতা-পূর্ণতা কথা পরবর্তী কপিল, দেবদত্ত ও পদ্মিনীর আগমন এবং ঘনিয়ে ওঠে আত্মসংকট— 'দেবদত্ত-পদ্মিনী পদ্মিনী-কপিল!' কবি দেবদত্ত আর পালোয়ান কপিলের অভিন্ন বন্ধুহৃদয়ের মাঝে পদ্মিনীর প্রবেশ দেবদত্তের 'অর্ধাঙ্গিনী' হয়ে। অতঃপর কপিলকে ঘিরে দেবদত্ত এবং পদ্মিনীর দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের মাত্রা তুষের আগুনের মতো চরমে পৌঁছয়— পুরনো কথানুসারে অর্থাৎ দেবদত্ত পদ্মিনীকে পেলে মা কালীর পায়ে হাত দেবার কথানুসারে মাথা দিয়ে দেয় আবার অন্যদিকে কপিল নিজেকে অপরাধী ভেবে সেও মাথা দিয়ে দেয় কালীর পায়ে!

''কা। বজ্জাত সব, হাড়বজ্জাত! মরবার আগেও মিথ্যে না বলে ছাড়ে না। ঐ যে দেবদত্ত— প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, মাথাটা দেবে রুদ্রকে আর হাতদুটো দেবে আমায়। ভেবে দেখো ব্যাপারটা— মাথাটা ওকে, আর হাতদুটো আমায়! আর তুমি জোরজার করে রুদ্রমন্দিরে গেলে বলে ইনি এখানে এসে মাথাটা কেটে বসে আছেন। আবার কায়দা করতো— যেন প্রতিজ্ঞা রাখবার জন্যেই করছে এটা— আর কিছু নয়! তারপর এই কপিল! মরল আমার সামনে— কিন্তু কী, না, বন্ধুর জন্য! ভেবে দেখো! ভদ্রতা করেও একবার আমার কথা বলল না। আর কী মিথ্যে। বন্ধুর জন্য মরছে! ব্যাটা জানত ঠিক যে ফিরে গেলে লোকে ধরবে ওকে, সবাই বলবে তোমার জন্য বন্ধুকে ও খুন করেছে। সে ভয় না থাকলে ভাবছ ও তোমাকে জাপটে ধরত না এইখানেই? কিন্তু তবু ঐ, 'বন্ধু সখা!'-ন্যাকা! এক তুমিই দেখলাম সত্যি কথা বলেছ!

প। তোমারই করুণা, মা!

কা। এর মধ্যে আবার আমাকে কেন? সত্যি বলেছ, কেননা তুমি ঘোর স্বার্থপর— এই তো ব্যাপার। যাকগে, আর বোকো না। যা বললাম তাই করো। চোখ বোজো।

প। হ্যাঁ, এই যে [পদ্মিনী তাড়াহুড়ো করে এর মুণ্ডু ওর ঘাড়ে লাগিয়ে দেয়, ঘাড়ের ওপর তরবারির চাপ দেয়, তারপর কালীকে নমস্কার করে এগিয়ে আসে, মূর্তির দিকে ফিরে দাঁড়ায়, চোখ বন্ধ।] আমি তৈরি।

কা। বৎসে! বদমাইসির একটা সীমা থাকা উচিত। যাই হোক,— তাই যদি চাও, তথাস্তু!''[৪৩]

— 'ওলটপালট মাথা'! কপিলের মাথা দেবদত্তের ঘাড়ে আর দেবদত্তের মাথা কপিলের ঘাড়ে! এবার পদ্মিনী দেবদত্তের শরীরের না কি কপিলের মাথার অথবা কপিলের শরীরের না কি দেবদত্তের

মাথার! পদ্মিনী কার? বিরতির পরবর্তীতে জানা যায়, পদ্মিনী পুরনো দেবদত্তের মাথানুসারে পুরনো কপিলের হয় অর্থা‘ নতুন মাথার দেবদত্তের—

‘‘প । নতুন শরীর নিয়ে এল প্রিয়, এল প্রিয়তম।

দ । [পৌরুষের হাসি] উৎসুক রমনী ছাড়া কে এই শরীর নেবে আর।

প । চলো যাই। [থামে] দাঁড়াও একটু। [কপিলের কাছে দৌড়ে গিয়ে] মন খারাপ কোরো না কপিল। আবার দেখা হবে। হবে না? [চুপি চুপি] দেবদত্তের সঙ্গে না গিয়ে আমার উপায় নেই। কিন্তু মনে রেখো আমি তোমারই শরীরের সঙ্গে আছি। এই ভেবে একটু খুশি হও। [দেবদত্তের কাছ গিয়ে] চললাম, কপিল।

দ। [কপিলকে চললাম। (জড়াজড়ি করে চলে যায় দুজন। কপিল চুপ। তারপর)’’[৪৪]

দ্বন্দ্ব চরম আকার নেয়— মাথা না শরীর, শরীর না মাথা নিয়ে! পদ্মিনীর এক জীবনে যেন ‘চার-চার পুরুষ’! কিন্তু মাথা বদলে দেয় শরীরকে, তাই কপিলের শরীর রূপ নেয় দেবদত্তের শরীরে আর দেবদত্তের শরীর পায় কপিলের শরীর। আবার বদল!

‘‘ক । মনে আছে, একদিন তোমায় আমি হিংসে করতাম তোমার কবিতা নিয়ে? আমার কাছে আকাশ ছিল আকাশ, গাছ শুধুই গাছ। তোমার শরীর আমার কাছে নতুন-সব অনুভূতি নিয়ে এল, নতুন-সব শব্দ, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল আমার ইন্দ্রিয়— এমন-কী একটুআধটু কবিতা লেখাও শুরু হলো। নিশ্চয়ই খুব খারাপ কবিতা। [দুজনেই হাসে] একটা সময় ছিল যখন এইসবের জন্যই এটাকে আমার ঘৃণা হতো।

দ । আমি তোমার সামর্থ্য চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমার উন্মত্ততা নয়। তুমি ঘৃণায় দিন কাটাচ্ছিলে, আমি আতঙ্কে।

ক । না আমারই ছিল ভয়।

দ । ওলটপালট কেমন, ওঠন-পড়ন-নামন। [হাসে দুজন] একটা কথা বলবে? পদ্মিনীকে তুমি ভালোবাসো?

ক । বাসি।

দ । আমিও।

ক । জানি। [চুপ সবাই] দেবদত্ত, এমন হয় না যে তিনজনে একসঙ্গেই রইলাম? দ্রৌপদী আর পাণ্ডবদের মতো?

দ । তোমার কী মনে হয়?

[চুপ। পদ্মিনী তাকায় দুজনের দিকে]

ক । (হেসে) নাঃ, সে আর হয় না।

দ । (তলোয়ার দেখিয়ে) সেই জন্যই এটা আনতে হলো। এম্‌নি এম্‌নি যার শেষ নেই, তাকে জোর করেই ছিঁড়ে ফেলতে হয়।''[৪৫]

অবশেষে আবার ঘোড়ামুখোর প্রবেশ— ঘোড়ামুখো অথচ মানুষের কণ্ঠস্বর নিয়ে! আবার অপূর্ণতার ছবি! ''হয়বদন'' নাটকটির এই অপূর্ণতার সর্বাংশ জুড়ে রয়েছে 'গম্ভীরতা' এবং 'লাঘবতা'। অনুবাদকের অনুবাদ পড়তে পড়তে সেই Temperament টের পাওয়া যায় এবং একবারের জন্যেও স্মরণে আসে না যে, একটি অনূদিত নাটকের পাঠ সম্ভাব্য হচ্ছে। জাতীয় জীবনের মূলকে নাড়া দিয়ে যায় পরতে পরতে। অনুবাদকের ভাষা ব্যবহারে, বিষয়ের উপস্থাপনে কোথাও কোন শিল্পহীনতার অভাব পরিলক্ষিত হয় না। অনুবাদক শঙ্খ ঘোষের মনন-বাঁচনের পরিচয় পাওয়া যায় এই নাটকটি অনুবাদ্য হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও। শৈলীগত দিক এবং সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সমগ্রের বাঁধন অনন্য।

শঙ্খ ঘোষ অনূদিত আর একটি অন্যতম নাটক ''রক্তকল্যাণ'' (১৯৯৫)। গিরিশ কারনাড বিরচিত মূল কন্নড় নাম ''তালেদণ্ড'' হিন্দিতে হলো ''রক্তকল্যাণ''। বাংলায় অনুবাদকের প্রধান নির্ভর নাট্যকারের অর্থাৎ গিরিশ কারনাডের নিজস্ব ইংরেজি অনুবাদ, তবে সংলাপের দু-একটি ক্ষেত্রে ইংরেজি পাঠের বদলে হিন্দি পাঠ গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে।

''মূল কন্নড় নাম 'তালেদণ্ড' হিন্দিতে হলো 'রক্তকল্যাণ'। এ-নামে নাট্যকারের সম্মতি ছিল বলে বাংলাতেও নাটকটিকে আমরা 'রক্তকল্যাণ'ই বলছি, 'তালেদণ্ড' নয়। কন্নড় এই শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো 'শিরশ্ছেদের শাস্তি'। তবে, এ-নাটকের প্রধান এক চরিত্র বাসবান্না যে তাঁর কবিতায় শব্দটি কখনো কখনো ব্যবহার করেছেন খানিকটা ভিন্ন তাৎপর্যে, 'শির উৎসর্গ করছি' অর্থে, মূল নাটকটির নামকরণের সময়ে নাট্যকারের মনে ছিল এই ভাবনাটা। কিন্তু এ-ভাবনার সঙ্গে নাটকটির অভ্যন্তরীণ যোগ যে তত স্পষ্ট এবং অনিবার্য নয়, এটা তিনি পরে বুঝেছেন। হিন্দি অনুবাদে 'নাটককারের বক্তব্য' বলতে গিয়ে সচেতনভাবেই তাই তিনি লিখেছেন : সনাতনবাদীদের ভয়ানক আক্রোশে শরণ আন্দোলন এমন আতঙ্ক আর রক্তস্রোতে ডুবে গেল যে সমগ্র 'কল্যাণনগরী হয়ে গেল রক্তকল্যাণ'।

বাংলা অনুবাদে আমাদের প্রধান নির্ভর ছিল গিরিশ কারনাডের নিজস্ব ইংরেজি। সংলাপের দু-একটি ক্ষেত্রে ইংরেজির পাঠের বদলে হিন্দি পাঠকে গ্রাহ্য করেছি, কিন্তু সর্বত্র নয়।''[৪৬]

নাটকটি তিনটি অঙ্কে ষোলটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ। নাটকটির বিষয়-কর্ণাটকের সন্ত কবি বাসবান্না বা বাসবেশ্বর। লিটায়ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বীরশৈব ধর্মের এই কবি তাঁর শিষ্যদের বোঝাতে

পেরেছিলেন যে মন্দিরের কোন মানে নেই, দেবতা আছে জঙ্গম জীবনের মধ্যে, প্রতিদিনের শ্রমের মধ্যে। শ্রমের এই জীবনদর্শনকে তিনি নাম দিয়েছিলে 'কায়ক', আর এই 'কায়ক' যারা মেনে নেন তাঁরাই তাঁর শিষ্য 'শরণ'। এইভাবে গড়ে উঠেছিল 'সব-জাতে-মেলানো এক শরণ-সম্প্রদায়'। জাত-পাত নয়, নারী-পুরুষ নয়— তাদের লক্ষ্য সমান-মর্যাদা, সমান-জীবন। এই সমানাধিকারের ধারণা জীবনের মধ্যে প্রয়োগ করতে গিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের তীব্র রোষের মুখে পড়েছিলেন বাসবান্না। বন্ধুস্থানীয় রাজা বিজ্জ্বল শেষপর্যন্ত সাহায্য করতে পারেননি, বরং শেষ সেই চেষ্টায় নিজেই হয়েছিলেন নিহত।

গিরিশ কারনাড এই নাকটটি লিখেছিলেন ১৯৮৯ সালে, ভারতবর্ষে যখন মণ্ডল কমিশন আর বাবরি মসজিদ নিয়ে উত্তেজনা চরমে। নাটকটির বিষয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের সন্ত কবি বাসবান্না— যাঁর মৃত্যুর পূর্ববর্তী সময়ে ভয়ংকর রক্তস্নানে মিশে গিয়েছিল কল্যাণ শহর। শঙ্খ ঘোষ অনুবাদ করেন ১৯৯৪ সালে। দ্বন্দ্বময় উত্তাল অবস্থা ভারতবর্ষের। অনুবাদকের কথানুসারে আজকের দিনের বিধ্বংসী রক্তপ্রবাহের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই নাটকের তুলনারহিত তাৎপর্য বর্তমান—

''দূত-৪। মহারাজ, কল্যাণ ছেড়ে পালাচ্ছে সব শরণ। দশদিকে ছড়িয়ে পড়ছে ওরা। উলুবির জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে এক দল। আরেকদল দৌড়চ্ছে অন্ধ্রের দিকে—

সোবিদেব। তাড়া করো। কেউ যেন না পালাতে পারে। পুরুষ, মেয়ে, বাচ্চা-সবাইকে কুচি কুচি করে কাটো। শিকারী কুত্তা লেলিয়ে দাও সবার পিছনে। সবকটা জঙ্গলের সবকটা ঝোপঝাড় খুঁজে খুঁজে দেখো। যে-বাড়িতে তারা জায়গা পাবে, জ্বালিয়ে দাও সেই বাড়ি, পুড়িয়ে দাও বইপত্র। টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলো ওদের, জ্যান্ত ফেলে দাও কুয়োর মধ্যে। চিরদিনের মতো স্তব্ধ হোক ওদের কথা— [কাড়ানাকড়া বেজে ওঠে। নারীদের শিশুদের চিৎকার, তার সঙ্গে সংঘর্ষের ঝন্‌ঝনা।] আমাদের রাজ্যের এই গভীর সংকট, এই সময়ে কি না আমার ভাইয়েরা আসছে আমাদের সঙ্গে লড়তে! বদমাস! বিশ্বাসঘাতক! এতেই তো বোঝা যাচ্ছে যে আমার বাবাকে, আমার পরম প্রিয় পিতৃদেবকে, কালচূর্য রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিজ্জ্বলকে খুন করবার ব্যাপারে ওদেরই ছিল হাত। ধ্বংস করো ওদের। এখন অতন্দ্র থাকবার সময়, এখন সতর্ক থাকবার সময়। রাজা হচ্ছে তার প্রজাদের পিতৃস্বরূপ। প্রজারাও সন্তানতুল্য হয়ে রাজাকে মানবে,

ভালোবাসবে। রাজার বিরুদ্ধে কথা বলবে না কেউ, কথা বলবে না রাজপরিবারের বিরুদ্ধে বা রাজার অনুচরদের বা অমাত্যদের বিরুদ্ধে। এই মুহূর্ত থেকে সমস্ত শরণকে সমস্ত বিদেশীকে সমস্ত মুক্তচিন্তার মানুষকে এ রাজ্যে নিষিদ্ধ করা হলো, শহরে পেলেই তাদের শিরশ্ছেদ করতে হবে। মেয়েরা অথবা নিচু জাতের লোকেরা আমাদের সনাতন ঐতিহ্যের নির্দিষ্ট প্রথা অনুযায়ী জীবনযাপন করবে। যদি কেউ তা না করে, তবে তাদের মরতে হবে কুত্তার মতো। প্রত্যেক নাগরিককে তৈরি থাকতে হবে যেন রাজারজন্য যে-কোনো মুহূর্তে প্রাণ দিতে পারে তারা। কেননা, রাজাই হলেন মূর্তিমান ভগবান।...''[৪৭]

অনুবাদকের ''হয়বদন'' এবং ''রক্তকল্যাণ'' নাটক অনুবাদের অভিমুখ স্পষ্ট হয়— এইবেলাতেও তিনি জীবন এবং প্রতিবাদকে আঁকতে আগ্রহী, দেখতে আগ্রহী। তাঁর নিজস্ব সংলাপেরই অনুরণন শোনা যায় এইসব অনুবাদ কর্মে—

''যে কোনো মানুষেরই সমাজের প্রতি কিছু দায় থাকে, কবিরও তা আছে। সে-দায় তিনি ব্যক্তিগত স্তরে বহন করবেন, এটা প্রত্যাশিত। সব কবি তা করেন না, সব ব্যক্তিমানুষও করেন না তা, সেটা ভিন্ন সমস্যা। কিন্তু এই দায় বহন করার মানে এই নয় যে, কবিতায় একজন কবিকে সব সময়ে সমাজের দিকে চোখ রেখে কথা বলতে হবে। এমনকী কোনোসময়েই তেমন তিনি না বলতে পারেন। তাতে এটা প্রমাণ হয় না যে তিনি সমাজবিমুখ। কেননা কবিতার মধ্য দিয়ে যদি ভিন্নতর কোনো সত্যের কোনো সুন্দরের বোধ তৈরি হয়ে ওঠে, কোনো কল্পনাজগতের যদি প্রসার হয়ে থাকে, সেও তো এরকম সমাজেরই কাজ, সামাজিক মননকে উদ্‌বোধিত করে তুলবারই কাজ। তাছাড়া, কে যে কীভাবে সমাজের দায় পালন করেন কবিতার ভিতরে, বহিরঙ্গে সেটা বোঝায় যায় না সবসময়।''[৪৮]

শঙ্খ ঘোষের আর একটি অনূদিত নাটক হল ''মানুষ'' (২০১৪ গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ, অনূদিত হয় ১৯৮৮ সালে)। জার্মান নাট্যকার হ্যাল্‌টের হাসেনক্লেভারের 'Die Menschen' ইংরেজি অনুবাদে রচনাটির নাম 'Humanity' , বাংলায় শঙ্খ ঘোষ করেন ''মানুষ''। নাটকটি মূলত এক্সপ্রেশনিষ্ট ধারার— জীবনের ক্ষয় অঙ্কিত, মনুষ্যত্বের কথা অঙ্কিত।

অনুবাদক হিসেবেও শঙ্খ ঘোষ দেশ, সমাজ, রাজনীতি, মানুষ-মানবতা-ভালোবাসা সচেতন। তাঁর সকল অনুবাদকর্মে জীবন এবং ঐতিহ্যের সামগ্রিক বোধ পরিষ্কার হয় এবং ধরা পড়ে কবিমানসের মিল। অনুবাদ করতে গিয়ে তাঁর যে নির্বাচন তাতে 'মন্থর পুনরাবৃত্তি'-এর আয়োজন নেই, বরং আছে মানবতাবাদী মনের নিঃংশয় প্রকাশ। মৌল স্বভাব বিসর্জন নয়, বিপরীতে

গিয়েও সমগ্রের খোঁজে ধাবমান এবং সমস্ত গণ্ডি ভেঙে ভেঙে প্রবেশ করেন জীবন ও ঐতিহ্যের মধ্যে, সমগ্র বিশ্বের মানুষসাধারণস্থানে।

> ‘‘শঙ্খের কবিতা-সমগ্র পড়ে পাঠক যেমন তাঁর মনোভঙ্গির একটা চালের পরিবর্তে বহুচালের, সমাজ পীড়ন থেকে সমাজ স্নিগ্ধতার অতিরেকে বিচরণের পরিচয় পান, যেমন তাতে আছে কিছু ব্যঙ্গ, কিছু অনিবার্যের কাছে অসহায়তা তেমনি আত্মস্থ গূঢ়তা, প্রসন্ন গাঢ়তার আভা। তাঁর অনুবাদের মধ্যেও এই পরিচয়ের জগৎকে আমরা আর একবার চিনতে পারি। যেমন তিনি সাহিত্যে জাত-পাতের বিরুদ্ধে, তেমনি সামাজিক জীবনে, এই মনোবৃত্তিই অনুবাদ করায় চেরাবাণ্ডারাজুর ‘কী আমাদের জাত’ বা ইকবালের ‘জাভেদনামা’ কিংবা লেখায় ‘অন্ধ বিলাপ’। যে ‘ট্রাজিক জিজীবিষা’ সত্তরের দশকে তাঁকে লেখায় শ্লোক, দশক, রক্তদান (প্রহর জোড়া ত্রিতাল) বা তিমির বিষয়ে দু-টুকরো (মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়) তা-ই তাঁকে চেরাবাণ্ডারাজুর ‘নতুন প্রজন্মের কাছে’ বাদ ‘তুমি আমাদের’ অনুবাদ করায়, সেটাই কাজ করে ‘হয়বদন’ অনুবাদে (যেখানে রাজনৈতিক নাটককে সমকালীন তাৎপর্যে অঙ্কিত করে তোলার মরিয়া কটাক্ষ থাকে ভূমিকায়) সেটাই কাজ করে গ্যিয়েনের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কবিতার পরিবর্তে ‘চিড়িয়াখানা’ অনুবাদের জন্য বেছে নেওয়ায়।’’[৪৯]

তথ্যসূত্রঃ

১. মাহাতা, বিনয়কুমার (অনুবাদ) : এই পৃথিবী পাগলাগারদ, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি ১১০০০১, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৫, অনুবাদকের কথাংশ।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.) : সুধীন্দ্রনাথ পাঠের ভূমিকা, ভারত বুক এজেন্সি, ২০৬ বিধান সরণি, কল-০৬, প্রথম প্রকাশ ২০০২, পৃ. ৬৩।

৩. মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ (সম্পা.) : নিঃশব্দের শিখা শঙ্খ ঘোষ, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ১৫৮, ১৫৯।

৪. ঘোষ, শঙ্খ; দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন (সম্পা.) : সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, দে’জ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৪৫।

৫. ঘোষ, শঙ্খ : বহুল দেবতা বহু স্বর, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ৯৬।

৬. ঘোষ, শঙ্খ, দাশগুপ্ত অলোক (সম্পা.): সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, দে'জ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ২০১।

৭. তদেব : পৃ. ২২১।

৮. মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ (সম্পা.): নিঃশব্দের শিখা শঙ্খ ঘোষ, অনুষ্টুপ ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ১৬৯।

৯. ঘোষ, শঙ্খ (অনুবাদ) : চিড়িয়াখানা ও অন্যান্য কবিতা (নিকোলাস গ্যিয়েন), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ বইমেলা ১৯৮৬, দ্বিতীয় সংস্করণ জুলাই ২০০৯, পৃ. ৫২।

১০. তদেব : পৃ. ৩৮।

১১. তদেব : পৃ. ৭৭।

১২. মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ (সম্পা.): নিঃশব্দের শিখা শঙ্খ ঘোষ, অনুষ্টুপ ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ১৭০, ১৭১।

১৩. ঘোষ, শঙ্খ : বহুল দেবতা বহু স্বর, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১১৫।

১৪. তদেব : পৃ. ১১৪।

১৫. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৯৮৭, পৃ. ৭১।

১৬. ঘোষ, শঙ্খ : বহুল দেবতা বহু স্বর, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১১৯, ১২০।

১৭. মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ (সম্পা.): নিঃশব্দের শিখা শঙ্খ ঘোষ, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০০ পৃ. ১৭৩।

১৮. ঘোষ, শঙ্খ : বহুল দেবতা বহু স্বর, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১২২।

১৯. Eliot, T.S. : The Complete Poems and Plays, First Published in 1969, Faber and Faber Limited, Bloomsbury House, 74-77 Great Russell Street, Londoan WciB3DA, P. 184.
২০. ঘোষ, শঙ্খ : বহুল দেবতা বহু স্বর, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১২২।
২১. তদেব : পৃ. ২৯।
২২. তদেব : পৃ. ১৩৩।
২৩. ঘোষ, শঙ্খ : গদ্যসংগ্রহ-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৭৪,১৭৫।
২৪. ঘোষ, শঙ্খ : বহুল দেবতা বহু স্বর, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ২০।
২৫. মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ (সম্পা.): নিঃশব্দের শিখা শঙ্খ ঘোষ, অনুষ্টুপ ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯, প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ১৭৫।
২৬. ঘোষ, শঙ্খ : বহুল দেবতা বহু স্বর, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তক মেলা জানুয়ারী ২০০২, পৃ. ২১।
২৭. তদেব : পৃ. ৭৪।
২৮. তদেব : পৃ. ৬৮।
২৯. তদেব : পৃ. ৭৫।
৩০. তদেব : পৃ. ১৯।
৩১. ঘোষ, শঙ্খ : ইরাকি কবিতার ছায়ায়, তালপাতা, অম্বা অ্যাপার্টমেন্ট এ-৩৮ ভি আই পি পার্ক, কল-১০১, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, দ্বিতীয় সংস্করণ মার্চ ২০১৪, পৃ. ৬৩।
৩২. তদেব : পৃ. ৭৩।
৩৩. তদেব : পৃ. ৮।
৩৪. তদেব : পৃ. ৪৫।
৩৫. তদেব : পৃ. ৫৭।

৩৬. তদেব : পৃ. ৪৬।

৩৭. তদেব : পৃ. ১২১।

৩৮. শঙ্খ, ঘোষ : ইকবাল থেকে, প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কল-০৪, প্রথম প্রকাশ ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২, দ্বিতীয় সংস্করণ ২৬ জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৩।

৩৯. তদেব : পৃ. ১০।

৪০. তদেব : পৃ. ২০০।

৪১. তদেব : পৃ. ২১২, ২১৩।

৪২. ঘোষ, শঙ্খ (অনূদিত) : হয়বদন (গিরিশ কারনাড), প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কল-০৪, প্রকাশ 'বহুরূপী' ৪৩ ভারতনাট্য সংখ্যা মার্চ ১৯৭৪, গ্রন্থাকারে প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮৬, পঞ্চম সংস্করণ নভেম্বর ২০১৪, পৃ. ১৯।

৪৩. তদেব : পৃ. ৩৯।

৪৪. তদেব : পৃ. ৪৪।

৪৫. তদেব : পৃ. ৬০।

৪৬. ঘোষ, শঙ্খ (অনুবাদ) : রক্তকল্যাণ (গিরিশ কারনাড), প্যাপিরাস ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কল-০৪, প্রকাশ স্যাস শারদীয়া ১৯৯৪, গ্রন্থাকার প্রকাশ বইমেলা ১৯৯৫, দ্বিতীয় সংস্করণ শরৎ ২০১২, পৃ. ৫।

৪৭. তদেব : পৃ. ৮৬, ৮৭।

৪৮. ঘোষ, শঙ্খ : কথার পিঠে কথা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১৮৪।

৪৯. মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ (সম্পা.): নিঃশব্দের শিখা শঙ্খ ঘোষ, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯, প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ১৮৪।